ক্ষণ-অন্তঃপুরিকা

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পারিশার্স লিমিটেড
১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক: শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ
জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ
১১৯. ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৩
মূল্য দুই টাকা

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেডের
মুদ্রণ বিভাগে [অবিনাশ প্রেস—১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট,
কলিকাতা] শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ কর্তৃক মুদ্রিত

‘ক্ষণ-অন্তঃপুরিকা’ সাহিত্যরসিক
বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অবনীনাথ রায়ের
করকমলে সমর্পণ করিলাম।

ব. ভ. ম.

সূচী

চিত্র সূচী



ক্ষণ-অন্তঃপুরিকা

বড়বাবু বলিলেন—"দেখো ক'টা বেজেছে, দেখো একবার চোখ তুলে।"

সেটা আফিসে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই দেখিয়াছে চঞ্চল; তবু নেহাৎ বাধ্যতার জন্য একবার চোখের পাতা তুলিয়া তখনই নামাইয়া লইয়া অনুতপ্ত কণ্ঠে বলিল—"হয়ে গেল একটু দেরি স্যার—আজও।"

বড়বাবু স্ক্রু-চেয়ারটার একটা পাক দিয়া ঘুরিয়া বসিলেন, গলা আরও একটু তুলিয়া বলিলেন—"একটু-টা কত তা নিজের মুখেই একবার বলো তো শুনি।"

চঞ্চল বাঁ হাতের মুঠাটা ডান হাতে চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"আজ মিনিট কুড়ি লেট হয়ে গেল স্যার....কি করি?"

"কিছু করতে হবে না, এমন কি কষ্ট করে আসতে পর্যন্ত হবে না কাল থেকে, আমরা অন্য লোকের ব্যবস্থা করছি। কেন ওয়ার টেকনিশিয়ান, এ-আর-পি—নানা রকম তো ব্যবস্থা হয়েছে—আমাদের জ্বালানো কেন?....আফিসের কাজ তো এ ভাবে চলতে পারে না...."

চাকরির ভয়েই চঞ্চলকে একটু মুখ তুলিয়া চাহিতে হইল, কাতর ভাবেই বলিল—"স্যার, এক ঘণ্টা থেকে কুড়ি মিনিটে দাঁড় করিয়েছি—মানে...."

"চলবে না, চলবে না বলে দিচ্ছি; এই কুড়ি মিনিট মেটাতে তোমার আরও মাসখানেক লাগবে। ও-ভাবে আফিস করা চলে না। যাও

আমি কেশিয়ারবাবুকে স্লিপ দিচ্ছি, হিসেব চুকিয়ে দেবে। যাও, অনেক চান্স দিয়েছি তোমাকে, আর পারব না।"

চেয়ারে আর একটা মোচড় দিয়া ঘুরিয়া বসিলেন।

চঞ্চল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সামনের ফাইলে গোটা-কতক সই করিয়া বড়বাবু ঘাড় ফিরাইয়া প্রশ্ন করিলেন—"তবু দাঁড়িয়ে রইলে যে?"

"আর একটা চান্স দিন স্যার। একেবারে আধ ঘণ্টার ওপর সময় বাড়িয়ে দিলে, তাও এনেছিলাম সামলে, কিন্তু ট্রামে চড়াই অসম্ভব হয়ে উঠেছে। আটখানা ট্রাম চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল, ঝুলতে ঝুলতে চলেছে লোকে—একটু যে পা রাখব তার জায়গা নেই। তবু চেষ্টা করতাম আগে, আজ চোখের সামনে একটা লোক পা পিছলে কাপড়-জামা ছিঁড়ে কোন রকমে প্রাণটা নিয়ে সামলে উঠল। আর সাহস হোল না। এদিকে এই অবস্থা, তার উপর আবার আজ-কাল মেয়েছেলেদের ভীড় হয়েছে, যদি বা দু'চার জন লোক নামে তো আগে তাদের পথ ছেড়ে দেয় সবাই; যেটুকু সময় থাকে তাতে জবরদস্তি উঠতে গেলে তাদের ঘাড়ে পড়তে হয়। এই করেই যাতে চড়তে পারার একটু চান্স আছে, সেগুলো যায় বেরিয়ে।"

বড়বাবু ঘুরিয়া বসিলেন, বলিলেন—"তা হ'লে যাও তুমি হেঁসেলে ঘোমটা দিয়ে বোসগে, বৌমাই বেরিয়ে চাকরি করুন। আমায় বোকা বোঝাচ্ছ, আমি তো ওদিককার ট্রামেই রোজ আসি; ভীড় নেই এমন নয়, তবে না উঠবার মতন অবস্থা নয়। আর যে রকম অবস্থাই হোক, যখন উঠতেই হবে তখন উপায় কি? তা নয়, মেয়েরা চড়ে আর তুমি হাঁ করে তামাসা দেখ, সোদ্দা কথা তো এই? তা এইবার যাও, সমস্ত দিন তামাসা দেখো গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।"

এর পরে আর দাঁড়ানো যায় না, চঞ্চল মুখটি চুণ করিয়া হলে ফিরিয়া আসিয়া নিজের চেয়ারে বসিল। পাশেই লেজার-কীপার মহিম বাবুর ডেস্ক। বয়স্ক লোক, সবার দাদা, একটু আড়ে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন—"ফলাফল ?"

চঞ্চল ঘাড়টা চেয়ারের পিঠে এলাইয়া দিয়া বলিল—"মানা করে দিলে কাল থেকে আসতে।"

"ওটা ওর কথার মাত্রা, চাকরি খাবে না, তবে হাঁ খিঁচোবে এই রকম।"

"এ ভাবে করাই বা যায় চাকরি কি করে দাদা? মান-ইজ্জৎ যেতে বসেছে কেন বলি, গেছেই—গেলই আজ থেকে।"

মহিম দাদা চকিত ভাবে ঘুরিয়া বসিলেন।

"গালমন্দ করলে ?"

"তারও বেহদ্দ।"

"মানে ?"

"বললে—তুমি ঘোমটা দিয়ে হেঁসেলে ঢোক গিয়ে, বৌ এসে চাকরি করুক....মেয়ে ছেলে টেনে কথা বলা দাদা...."

মহিম-দাদা আবার নিশ্চিন্ত ভাবে বসিলেন, লেজারের উপর কলমটা ধরিয়া বলিলেন—"বৌ নয় বৌমা বলেছে।"

চঞ্চল একটু বিস্মিত ভাবে প্রশ্ন করিল—"আপনি কি করে জানলেন ?....হ্যাঁ, তাই বললে—'বৌমা এসে চাকরি করুক'।"

"লক্ষণটা ভালো, মানে, তুমি এখানকার পরিবারভুক্ত হয়ে গেলে। ঐ বুলি ওর, আমরাও বাদ যাই না। বুড়োর কিন্তু গুণ আছে হে—বৌমা টেনে কথা বললে তো বুঝতে হবে নিশ্চিন্দি, তবে হ্যাঁ, তোমরা সব আধুনিক আধুনিকা, তোমাদের অপমানই মনে হবে।"

একটু হাসিয়া মাথাটা দুইবার দুলাইয়া লেজারে মনোনিবেশ করিলেন; চঞ্চল চুপ করিয়া সেই ভাবে বসিয়া রহিল। মহিম দাদার ব্যাখ্যানে মনটা উহারই মধ্যে একটু হাল্‌কা হইয়াছে, খানিক পরে বলিল—"তা নয় হোল,—বাপের বয়সী উনি বৌকে টেনে বলেন ছুটো কথা, বলুন; কিন্তু এই খিঁচুনি সহ্য করব কত দিন? আর তর্কের কায়দাটা দেখুন দাদা—বলে 'আমিও তো ঐদিক-কার ট্রামেই রোজ আসছি।' উনি ওঠেন সেই টালিগঞ্জের ট্রাম-ডিপোয় দাদা। বলবেন, আমিও তো কালীঘাট ডিপোতেই উঠি। উঠি ঠিক কিন্তু কালীঘাট আর টালিগঞ্জ এক হোল? এক মন্দিরেই তো বাজী মাত করে রেখেচে। তার ওপর আফিস কলেজ, ডিপোতে ঢোকবার অনেক আগেই বোঝাই হয়ে যায়। কিন্তু কে এত আরগুমেণ্ট করে বলুন?"

মহিম দাদা কাজের মধ্যেই শুনিতেছিলেন, একটা টোটেল দেওয়া শেষ করিয়া বলিলেন—"আরগুমেণ্ট নিয়ে তো ওর মাথা ব্যথা পড়েনি, আসলে ওর ঐ কথাগুলি বলবার জন্যে জিভ চুলকুচ্ছিল, দিব্যি সরস কথাগুলো তো?....কি বললে বৌমাকে চাকরি করতে পাঠিয়ে দিয়ে তুমি ঘোমটা টেনে হেঁসেলে ঢোক গিয়ে? একবার রসটা দেখো বুড়োর!"

পকেট থেকে নস্যির ডিবেটা বাহির করিয়া মিটি মিটি হাসির সহিত মাথা দুলাইয়া দুলাইয়া ছিপিতে টোকা মারিতে লাগিলেন।

চঞ্চল বলিল—"তা মিছেও বলেনি দাদা। এক একবার সত্যিই মনে হয় মেয়ে হয়ে জন্মালে ছিল ভালো। বেশ কাটিয়ে যাচ্ছে। লেডি হোল তো ট্রামও একটু খাতির করে দাঁড়ায়। লোকেরাও ওরই মধ্যে যতটা সম্ভব খাতির করে উঠতে সাহায্য করে। বাঁধা সীট রয়েছে, এদিকে আমাদের হিস্যে কেটে আরও বাড়িয়েও দিয়েছে, তাতেও কুলোয় না। মাঝখান থেকে মারা পড়ি আমরা; মানে, বহু জন্মের

পুণ্যে যদি একটু জায়গা পেলেন, গুছিয়ে বসলেন, একটু পরেই ঘুরে দেখেন এক জন লেডি দাঁড়িয়ে....দিন সীটটি ছেড়ে। ওরাই চাকরি করুক দাদা....”

“তাই করবে, তাই করবে”—মাথা দুলাইয়া অল্প একটু হাসিতে হাসিতে মহিম দাদা আবার খাতায় মনোনিবেশ করিলেন! এক জায়গায় কলমের টিক দিয়া বলিলেন—“খাতাগুলো খুলে-ছড়িয়ে বোস ভায়া, চাকরির দাঁও-প্যাঁচগুলো শেখো, নতুন মানুষ....”

চঞ্চল হঠাৎ অন্যমনস্ক হইয়া উঠিয়াছে। মনটা একটু হাল্‌কা হওয়ায় সমস্ত ব্যাপারটারই যেন রং বদলাইয়া গিয়াছে তাহার কাছে। কেমন হয়? ধরো, বেটাছেলেরাই হেঁসেলে ঢুকিয়াছে, আর মেয়েরা উমেদারী করিয়া চাকরি জোগাড় করিতেছে, ব্যবসায় চালাইতেছে, মানে, যত কিছু হ্যাপা সব তাহাদের ঘাড়ে। শোনা যায় বর্মায় কতকটা ঐ ধরণের ব্যাপার। বাঁচা যায় তাহা হইলে।

খাতা পত্রগুলা টেবিলে ছড়াইয়া একটা সামনে খুলিয়া ভাবিতে লাগিল। বোধ হয় হেঁসেলের নিশ্চিন্ত কোণে আশ্রয় পাইবার কোন আশা নাই দেখিয়া ফোঁস করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল। চিন্তার মোড় ফিরিল।

—বেশ খাতির ওদের, বেশ আছে। অত ভীড় ট্রামে, ওদের পক্ষে যেন খোলা মাঠ—‘লেডি হ্যায়, জেনানা হ্যায়....ডেড স্টপ...এক দমসে বাঁধকে!...একটু দোর ছেড়ে আপনারা নেমে দাঁড়ান না মশাই, দেখছেন না, মেয়েরা দাঁড়িয়ে রয়েছেন?’

সত্যিই বেশ আছে; এদের খাতিরের অর্ধেকটাও যদি পাওয়া যাইত তো বড়বাবুর এ গঞ্জনাটা আর....

চিন্তার মধ্যেই চঞ্চলের চোখ দুইটা একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

মাথায় যেন একটা আইডিয়া আসিয়াছে—অতি ক্ষীণ একটা আলোকের রেখা। চঞ্চল ডেস্কে কনুই দিয়া একটা আঙ্গুলের নখ দাঁতে খুঁটিতে খুঁটিতে স্থির দৃষ্টিতে সামনের দিকে চাহিয়া রহিল। চোখ দুইটি আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।....মুখে ধীরে ধীরে একটি হাসি পর্যন্ত ফুটিয়া উঠিল। অন্যমনস্ক ভাবেই খাতায় একটা ঘুঁসি মারিয়া অর্ধস্ফুট স্বরে বলিল—"ঠিক হয়েছে।" কাজের জন্য পাতা উলটাইল। মহিম দাদা প্রশ্ন করিলেন—"কি ঠিক হোল ভায়া?"

"বৌকেই পাঠাব দাদা, না হয় তার প্রতিভূকে।"

২

আফিস থেকে ফিরিবার পথে চঞ্চল একবার নরেশের দোকান হইয়া চাঁদনিতে চলিয়া গেল এবং একটা বড় কাটা-কাপড়ের দোকানে উপস্থিত হইয়া বলিল—"একটা বোরখা চাই।"

"মাপ?"

"মাপ আনা হয়নি; এই আমার গায়ের হলেই চলবে।"

দোকানী একটু বিস্মিত ভাবে চাহিতে, হাসিয়া বলিল—"না, আমি পরব না, যিনি পরবেন তিনি মাথায় প্রায় আমার সমান, একটু উনিশ-বিশে ক্ষতি হবে না, বোরখাই তো।"

দেখা গেল নেহাৎ "বোরখাই তো" বলিয়া অবহেলা করিবার জিনিস নয়, তাহারও আবার আন্দাজ আছে—মাথাটি ঠিকভাবে গলা চাই, চোখের জালতি দুটি ঠিক জায়গায় আসিয়া পড়া চাই, এসবের সঙ্গে আবার দৈর্ঘ্যের সম্বন্ধ আছে। বাছিয়া মিলাইয়া কিনিতে আরও

কয়েকটা দোকান ঘুরিতে হইল, বাড়ি ফিরিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গেল। বোরখার মোড়কটা নিজের দেরাজে বন্ধ করিয়া চঞ্চল বিষণ্ণভাবে বাহিরের রকে আসিয়া বসিল।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন—"অমন করে বসলি যে, শরীর ভালো আছে তো?"

চঞ্চল মুখটা ভার করিয়াই বলিল—"শরীর না ভালো থাকলে এসব সইবে কে বলো?"

স্ত্রী বরুণা আসিয়া উদ্বিগ্ন ভাবে বারান্দার দরজার পাশটিতে দাঁড়াইল। মা আগাইয়া আসিয়া চিন্তিত ভাবে প্রশ্ন করিলেন—"ও কথা বললি কেন রে? এলিও আজ বড্ড দেরি করে…"

চঞ্চল কতকটা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিল—"মা, তোমরা ঠাকুর-দেবতা আর মানো না?"

"হঠাৎ এ কি কথা?…অবিশ্যি আমাদের ভক্তি তেমনি, দিনান্তেও একবার মনে পড়ে না তাঁদের কথা—তবুও হঠাৎ ও কথা জিগ্যেস করলি যে?"

"করলাম জিগ্যেস। চাকরিটা হোল, তারপর একবার মানসিকটা দিতে গিয়েছিলে কালীঘাটে, তারপর যে ভুলে, আর…"

একটু থামিয়াই বলিল—"ঠাকুর-দেবতার সঙ্গে তো আর লুকোচুরি চলে না, তোমরাও ভুলেছ দেখে তিনিও ভুলেছেন, চাকরিটি হোল, কিন্তু রাখা যাবে না…"

"সে কি রে!"—বলিয়া মা শিহরিয়া উঠিয়া মুখের পানে চাহিলেন।

চঞ্চল বলিল—"তাই এত করে করেও ট্রামে দেরি হ'য়ে যাচ্ছেই একটু, তাইতেই কাল থেকে আসতে বারণ করে দিলে। মাইনে চুকিয়ে

দেবার জন্যে কেশিয়ারকে অর্ডার দেবে বলেছিল, সেটা আর দেয়নি, তাইতে মনে হচ্ছে কালকের দিনটা দেখবে, কিন্তু ট্রামের তো সেই অবস্থাই....”

মা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন—“নিজের মুখে বলা পাপ, তবু মার মন্দিরে যে একেবারে যাইনি এমন কথা তো নয়। তবু অপরাধ হয়ে গেছে, এক্ষুনি গিয়ে মার পূজো দিয়ে নাকে খৎ দিয়ে আসছি ; মা যেমন হাত তুলে দিয়েছেন, বজায় রেখে দিন....”

চঞ্চল একটু সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলিল—“তুমি একলা গেলে হবে ?”

“তুইও যাবি বলছিস্ ? সে তো আরও...”

“আমার কথা হচ্ছে না, আমাদের ভক্তি-বিশ্বাস কত তা মা জানেন, গেলে উল্টো ফলই হবে। বলছিলাম....”

বারান্দার দোরের দিকে মুখটা একটু ঘুরাইল।

“ও, বৌমার কথা ? তা চলুন, যাবেন বৈ কি।”

“তা হ'লে সতীও যাক্, বোনই তো।”

নাম করিলে আর 'না' বলিতে সাহস হয় না, ঠিক হইল তিন জনেই গিয়া মা-কালীর দ্বারস্থ হইবেন।

চঞ্চলকে জলযোগ করাইয়া একটু গা-ঢাকা হইবামাত্র তিন জনে বাহির হইয়া পড়িলেন। মন্দির কাছেই, মা থাকিলে আর কাহারও সঙ্গে যাওয়া দরকার হয় না, তবু চঞ্চল ছোট ভাই চপলকে সঙ্গে করিয়া দিল, বলিল—“একজন বেটাছেলে সঙ্গে থাকা ভালো, যা দিন-কাল পড়েছে।”

মনে একটু খট্‌কা তুলিয়া দিলে আজকাল আর প্রতিবাদ করিতে সাহস হয় না ; চপলও গেল।

সবাইকে সরাইয়া দিয়া চঞ্চল বাহিরের দুয়ারে খিল আঁটিয়া নিজের

ঘরে আসিয়া দেরাজটা খুলিল। তাহার পর আরশির সামনে দাঁড়াইয়া বোরখাটা পরিয়া ফেলিল। অদ্ভুত প্রতিচ্ছায়া! মুখে একটা হাসি ফুটিল, অতিসংকোচশীলার মতো সেটা ভিতরেই রহিয়া গেল, আরশিতে শুধু জাগিয়া রহিল একজোড়া বিস্মিত চোখ।

কিন্তু দাঁড়াইয়া থাকিবার সময় নেই। চঞ্চল পা টিপিয়া টিপিয়া বাহিরে আসিল। বেশ বাধ-বাধ ঠেকিতেছে, চোখের জালতি দুইটা সরিয়া সরিয়া গিয়া দেখার অসুবিধা হইতেছে। মাথার অংশটা ঠিক করিয়া বসাইয়া লইয়া চঞ্চল উঠানে নামিল এবং এলোমেলো ভাবে চার পাঁচটা চক্র দিল। উঠান শেষ হইলে সমস্ত ঘরগুলা কয়েক বার ঘুরিয়া ছাতে যাইবার সিঁড়িতে উঠিল। ছাতে উঠিল না, তবে সিঁড়ি দিয়া কয়েকবার উঠা-নামা করিল। আবার উঠান, আবার ঘর। প্রায় আধ ঘণ্টাটাক পরে যখন বাহিরে কড়ানাড়ার শব্দ হইল তখন বেশ এক চোট প্র্যাক্‌টিস্ করিয়া চঞ্চল রকে বসিয়া আছে। দুয়ার খুলিয়া দিল। এই ভাবে মহল্লা দিবার পর চঞ্চল বোরখাটা দেরাজে তুলিয়া রাখিল, তাহার পর রকে একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

৩

কালীঘাট ট্রামডিপোর পিছনটা নূতন বালিগঞ্জ এবং পুরাতন কালীঘাটের সংগমস্থল। জায়গাটার একটু বিশেষত্ব আছে—খানিকটা পড়তি জায়গা, খানিকটা নোংরা বসতি। কিছু এঁদো গলি, দুপাশে খোলার বাড়ি আছে, টিনের ছাতের কাদা-লেপা বাড়িও আছে, আবার কোঠাবাড়িও বিরল নয়, তারই পাশে আবার নূতন ধাঁচের রাস্তা, দুদিকে

নূতন ধরণের বাড়ি। তাহারও মাঝে মাঝে আবার খোলা, টিন, ছ্যাঁচা বেড়া।

একটা বেশ বড় পার্কও আছে—সকাল সন্ধ্যায় গম-গম করিতে থাকে; তাহার পিছনেই জায়গাটা যেন মরা,—বেশ খানিকটা জায়গা লইয়া মহীশূর নবাববংশের অনেকগুলি কবর। তার হাওয়াটাই যেন ছাইয়া আছে জায়গাটিতে। একটু উত্তরে আবার গ্রীক চার্চ। বাসিন্দারা পাঁচ-মিশিলি, ইতর-ভদ্র, হিন্দু-মুসলমান, নব্য, পুরাতনী হরেক রকমের লোক, তার পাশা-পাশি খুঁজিয়া দেখিলে বোধ হয় কিছু কিছু ক্রিশ্চানও পাওয়া যাইবে।

খুব সম্ভব এই জায়গাটা ভাঙিয়া গড়িবার মুখেই লড়াই শুরু হইয়া যায়। পুরাতন সহরতলী কলিকাতার একটা অংশ এখানে নিজের বৈশিষ্ট্য লইয়া বাঁচিয়া আছে।

এই পাড়াতেই একটি কানা গলির শেষ বাড়ি চঞ্চলদের, গলির মাঝামাঝি আসিয়া তিন ঘর গৃহস্থ মুসলমান, গলির মুখে লোকমারা ব্যবসায় পয়সা করিয়া একটি ভদ্রলোক অ্যামেরিক্যান প্যাটার্নের একটি বাড়ি তুলিয়াছে।

চঞ্চল ভাবিতে লাগিল। জায়গাটা এমন যে এখানকার রাস্তা দিয়া যদি বোরখা পরিয়া যাওয়া-যায় তো বিশেষ কৌতূহল আকর্ষণ করিবার সম্ভাবনা নাই। আসলে গলির ঐ মুসলমান-পরিবারের স্ত্রীলোকদের বোরখা ব্যবহারের কথা থেকেই ওর মনে পড়িয়াছে বোরখার কথা। এ-পাড়ার পুরাতন বাসিন্দা হিসাবে তাঁহারা আসেনও চঞ্চলদের বাড়ি কখন কখন,—তবে ঐ বোরখা পরিয়া।

পথে একবার পড়িতে পারিলে আটকাইবে না। ওদিককারও ব্যাপারটা একরকম ঠিক করিয়া রাখিয়াছে। আফিস হইতে বাহির

হইয়া সোজা নরেশের দোকানে গিয়াছিল। নরেশ বাল্যবন্ধু বলিলেও চলে, তবে বয়সে অনেকটা বড়, এইট্থ্ ক্লাশ পর্যন্ত একসঙ্গে পড়িয়া স্কুল ছাড়িয়া দেয়। কালীঘাটেই বাড়ি। স্ট্র্যাণ্ডরোড থেকে একটু ভিতরে গিয়া ব্যাফ্ল্ওয়াল ঢাকা একটা ঘুপচি গলির মধ্যে তাহার চায়ের দোকান। দোকানের ভেতরেও কয়েকটা অলিগলি আছে, নড়-বড়ে কাঠের সিঁড়ি লাগান একটা কাঠের দেয়াল দেওয়া ঘরের মতো আছে, তাহার মধ্যে দিয়াও আবার ওদিকে কোথায় যাওয়া যায়। স্থানটা একটু রহস্যময়। নরেশের এই দোকানে গিয়া বোরখাটা ছাড়িয়া চঞ্চল স্ট্রাণ্ড রোডে তাহার আফিসে গিয়া উঠিবে, বড় জোর আর মিনিট পাঁচেকের রাস্তা। দায়ে পড়িয়া এ সাহায্যটুকু চাহিলেও চঞ্চল এর বিপদের কথা বলিয়াছিল নরেশকে,—এই যে একজন বোরখা পরা স্ত্রীলোককে—এক হিসাবে যুবতীকে তাহার দোকানে প্রবেশ করিতে দেখিবে আশপাশের লোকে, এতে দোকানের বদনামের ভয় আছে তো?

নরেশ অল্প হাসির সহিত একটা চোখ টিপিয়া জিহ্বা আর তালুর যোগে টকাস করিয়া একটা আওয়াজ করিয়া বলিয়াছিল—"তুই নিজের চাকরি সামলা, সে ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না; বদনাম, ভয়, এসবের ভাবনা যদি ভাবতো তো নরেশ স্ট্রাণ্ড রোডের এলাকায় এ রকম দোকান হাঁকড়াতে পারত না। তুই এসে বোরখাটি সোজা আমার হাতে দিয়ে বেরিয়ে যাবি। হেঁয়ালি সামলাবার ভার আমার ওপর। আর এমন ছোটখাট হেঁয়ালি নিয়ে এখানে কেউ মাথা ঘামায় না।"

আবার সেই ভাবে সেই রকম একটা শব্দ করিয়া কয়েক সেকেণ্ড ধরিয়া মাথা দুলাইয়াছিল। ভাল-মন্দ যাই হোক চঞ্চল আর ওদিকটা চাহিতেছে না, চাহিলে যখন চলিবেও না; নরেশের উপর ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত আছে। চিন্তা হইতেছে এদিকটা লইয়া; বাড়ির মধ্যে বোরখা

পরিবেই বা কি করিয়া, দুয়ার খুলিয়া বাহির হইবেই বা কি করিয়া? রাস্তায় একবার নামিয়া পড়িতে পারিলে আটকাইবে না, কিন্তু নামাটাই হইতেছে সমস্যা। আর রাস্তায় নামিয়া বোরখাটা পরিতে গেলে তো চলিবে না। কানা গলি, লোক চলাচল অল্প, হয়তো একেবারে যখন খালি, টপ করিয়া পরিয়া লইল, কেহ দেখিতেও পাইল না। কিন্তু দেখিতে পাওয়ার সম্ভাবনাও তো আছে। প্রতিবেশীদের জানলা ঘুলঘুলি আছে, হয়তো বা কেউ ঠিক তালের মাথায় দুয়ার খুলিয়া বাহির হইয়া আসিল। এ কি, মিত্তিরদের চঞ্চল বোরখা পরে কেন!

ভাবিতে লাগিল চঞ্চল। ঐ সময়টা মা থাকেন পূজায়। চপলের দিক থেকেও নিশ্চিন্ত। সে মাস্টারের নিকট পড়িতে যায়। কিন্তু বৌ আর সতীর সে সময়টা কাজের ভয়ানক ভীড়, সমস্ত বাড়িটাতে চরখির মতো ঘুরিতে থাকে, তাহাদের দৃষ্টি এড়াইবার তো কোন উপায়ই নাই। অনেক রকম ভাবিল, কোন সমাধানই নাই।....নাঃ, চলিবে না; মেয়েদের পছন্দ না হইলে পরদিন ফিরাইয়া দিবে এই বলিয়া আনিয়াছে বোরখাটা, কাল ফিরাইয়া দিয়া আসিবে।....কোথা থেকে যে একটা আজগুবি খেয়াল উঠল।

কড়া-নাড়ার শব্দ হইল। চঞ্চল ধীরে ধীরে গিয়া দরজা খুলিয়া দিল।

৪

সমাধানটা শেষকালে আপনি-আপনিই হইয়া গেল, অবশ্য যে-ভাবে হইল তাহার গোড়াটা খুব আনন্দজনক নয়।

আহারের পর চঞ্চল একটা সিগারেট ধরাইয়া ছাতে গিয়া মাদুর বিছাইয়া শুইয়াছে, ঐ চিন্তা, এমন সময় বধূ বরুণা ধীরে ধীরে উপরে

আসিয়া পাশে দাঁড়াইল। ডান হাতটা পেছনে, ভাবটা অতিমাত্র গম্ভীর। চঞ্চল কিছু প্রশ্ন করিবার আগেই বলিল—"আজ একটা নতুন জিনিস পেলাম।"

চঞ্চল রসিকতারই চেষ্টা করিল, বলিল—"মা-কালীর সন্ত সন্ত দয়া! জিনিষটা কি?"

বধূ হাতটা সামনে আনিয়া মুঠাটা খুলিয়া ধরিল, গোটান-সোটান বোরখাটা চঞ্চলের পায়ের সামনে লুটাইয়া পড়িল।

চঞ্চল বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিল—"তুমি এ কি করে পেলে?"

বধূ স্বর আরও সংযত করিয়া বলিল—"মা-কালীর সন্ত সন্ত দয়া; ট্রাঙ্কের চাবিটা পাচ্ছিলাম না, গরদের শাড়িটা তোমার দেরাজেই রাখতে গিয়ে...."

চঞ্চলের মাথায় ততক্ষণে একটা আইডিয়া আসিয়াছে—বধূ যখন দেখিয়াই ফেলিল। বলিল—"ভালোই হোল, যখন টের পেয়ে গেলেই...."

বধূ প্রশ্ন করিল—"কার?"

"আমার....মানে..."

"আমি 'মানে'টার কথাই জিগ্যেস করছি। এখন তোমার তো দেখতেই পাচ্ছি খুব আদর যত্নে রেখেছও, আগে কার ছিল?"

মনে কোন কু না থাকিলে যাহা হয় এতক্ষণ তাহাই হইয়া আসিতেছিল, অর্থাৎ সমস্ত ব্যাপারটাই চঞ্চল সাধারণ ভাবে লইয়া আসিতেছিল; বধূর শেষ প্রশ্নটিতে তাহার চমক ভাঙিল, মুখের দিকে একটু চাহিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিল—"আগে কার ছিল...? হঠাৎ এ প্রশ্ন যে?"

"হঠাৎ টের পেলাম আজ, এর আগে কি করে করতাম?"

চঞ্চল একটু চুপ করিল, তাহার পর ব্যাপারটাকে বোধ হয় তরল

করিয়া ফেলিবার জন্যই বলিল—"এর আগে ছিল দোকানীর; আমি কিনেছি।"

"বেশ, তাই মেনে নিলাম।....কার জন্যে?"

ঘটনাচক্রে অবস্থাটা যেমন দাঁড়াইল, চঞ্চলের হাসিই ঠেলিয়া আসিতেছিল, তবু তর্কটা চালাইবার জন্য গম্ভীর ভাবেই বলিল—"নিজের জন্যে।"

"এত-বড় নিজেরটা কে সেই কথাই জিগ্যেস্ করছি।"

একটু বিরতি দিয়াই বলিল—"শীগগির বলো, নৈলে আমি মার কাছে ঐটে নিয়ে গিয়ে সব কথা বলব—চেঁচাব—ছাত থেকে লাফিয়ে মরব—বলো—বলো...."

হঠাৎ রাগটা বাড়িয়া গেছে, গলার আওয়াজও আর ততটা চাপা নাই, চঞ্চল উঠিয়া হাতটা ধরিয়া ফেলিল, বলিল—"বলছি; কিন্তু তুমি রাগের মাথায় ঠিক উলটো কথা বলছ যে। না বললে চেঁচাবে, লাফাবে, মাকে বলবে বলছ, কিন্তু বললেই যে ঐ রকম করবার সম্ভাবনা বেশি আরও—যেমন সন্দেহ তোমার। তার কি হবে?"

"বেশ কিছু করব না, তুমি বলো, আমাদের সব সয়..."

কণ্ঠস্বর শান্ত, এর মধ্যেই যেন ভিতরে ভিতরে অন্য-রকম সংকল্প করিয়া লইয়াছে।

চঞ্চল বলিল—"বসো তাহলে। ও-রকম উতলা হয়ে এসব কথা শোনা চলে না।"

বধূ ধীরে ধীরে বসিল, হাতটা চঞ্চলের হাতেই আছে। চঞ্চল বলিল—"শোনবার আগে একটা কথা বলো,—আমি তো বানিয়েও বলতে পারি..."

"বানিয়ে বললে আমি টের পাবো।"

"সত্যি কথা বললে ?"

"তাও টের পাবো।"

চঞ্চল সিগারেটে একটি টান দিয়া অল্প হাসিয়া বলিল—"ওটা মিছে গুমর তোমাদের।"

"কখনও নয়, বলে দেখো।"

"অনেকক্ষণ বলেছি।"

"কি ?"

"নিজের জন্যে কিনেছি।"

বধূ স্থির দৃষ্টিতে একটু মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তাহার পর ব্যঙ্গের স্বরে বলিল—"নিজের জন্যে বোরখা কিনেছ ? এমন সত্যি কথা যেন আর কাউকে বলতে যেও না।"

"তোমাকেও বলতাম না, অনেক রকম মিথ্যা ছিল ; দেখলাম বললে কাজ হবে।"

দু'জনেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল একটু। চঞ্চলের বলিবার ভঙ্গিতে বধূ কতকটা শান্ত হইয়াছে, এখন যেন একটু বিমূঢ়, ঠিক বুঝিতে পারিতেছে না।

চঞ্চল পিঠে হাত দিয়া প্রশ্ন করিল—"করলে বিশ্বাস ? অন্য দিক থেকেও জিগ্যেস্ করি,—অবিশ্বাসটা গেল ?"

"তুমি বোরখা নিয়ে কি করবে ?—থামো, থিয়েটার নয়তো ?"

চঞ্চল আবার একটু চুপ করিল, তাহার পর বলিল—"ঠিক থিয়েটার নয়, তবে অভিনয় বটে,—মেয়ে সেজে আফিসে যাব।"

বধূ বিস্ময়ের চোটে একটু পিছনে ঝুঁকিয়া গেল, একরাশ প্রশ্ন করিয়া বসিল—"কি জ্বালা !—কেন ?—তা কি করে যাবে এতটা পথ ?—

আফিসে ঢুকতে দেবে ?—আফিসের ওরাই কিনতে বললে না কি ? এ আবার কি নতুন ধরণের চাকরি বাপু !—"

চঞ্চল বধূর বিপর্যস্ত ভাবটা উপভোগ করিতেছিল, হাসিতে হাসিতে তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া বলিল—"শোন, অনেক কথা যে জিগ্যেস্ করে ফেললে !"

ধীরে ধীরে সব বলিল। বাহির হইবার সময় সতীকে ওদিকে কাজে আটকাইয়া রাখিয়া তাহাকে সঙ্গে আনিয়া সদর দরজাটি কি করিয়া সন্তর্পণে দিয়া দিতে হইবে, যদি কেহ বাহির হইতে দেখিয়া ফেলে, শেখেদের বাড়ির মেয়ে বলিয়া কি করিয়া কাটান্ দিতে হইবে, সে সব বিষয়েও সলাপরামর্শ হইল। তাহার মধ্যেই বধূ একবার ভীত ভাবে প্রশ্ন করিল—"হ্যাঁগা আর যদি জড়িয়ে পড়ে যাও ভীড়ের মধ্যে !"

চঞ্চল অবস্থাটা একটু ভাবিল, বলিল—"তাহলে একদিক থেকে অন্ততঃ অভিনয়টা সত্যিকেও ছাড়িয়ে যাবে ; মানে, মেয়েছেলের চেয়েও বেশি লজ্জায় পড়ে যেতে পারব। আর যে বেচারিরা মেয়েছেলে ভেবে তাড়াতাড়ি তুলতে আসবে...."

দু'জনেই চাপা-গলায় হাসিয়া উঠিল। রাগে অভিমানে যে প্রসঙ্গটা আরম্ভ হইয়াছিল সেটা এই ভাবে শেষ করিয়া অনেক রাত্রে দু'জনে নিচে নামিল।

৫

পরদিন বেলা আন্দাজ সওয়া নয়টার সময় একটি বোরখা-পরা মূর্তি গ্রীকচার্চের পাশের সড়ক দিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া কালীঘাট ট্রাম-ডিপোর শেডটির নিচে দাঁড়াইল। বোরখা থাকিলে আর বর্ণনার হাঙ্গাম

থাকে না, সমস্ত শরীরের মধ্যে মূর্তির দেখা যাইতেছে দুটি পা, সেইটি মুসলমানী ফ্যাশানের একজোড়া চটিতে অর্ধেক ঢাকা।

ও খেয়ালটা চঞ্চলের একেবারেই হয় নাই, কেমন একটা ধারণা থাকিয়া গিয়াছিল একটা বোরখা হইলেই সব কিছু ঢাকা পড়িয়া যাইবে। বধূই জিজ্ঞাসা করিল—"আর তোমার জুতো ?"

সকালে গিয়া একজোড়া সস্তা ফুলকাটা চটি কিনিয়া আনিল। বধূ হাতে চারগাছা করিয়া চুড়ি এবং পায়ে একটু করিয়া মেহদির কথাও বলিয়াছিল, তবে সেটা ঠাট্টা করিয়া।

শেডের মধ্যেই এত ভীড় যে জায়গা পাওয়া মুশকিল, তবু চঞ্চল অল্প সময়ের মধ্যেই সামনে আসিয়া পড়িল। বেশি চেষ্টাও করিতে হইল না, মেয়েছেলে, বিশেষ করিয়া বোরখা-পরিহিতা দেখিয়া সবাই উহারই মধ্যে একটু পথ করিয়া দিল। বয়স্থ দু-একজন একটু মন্তব্যও করিল— "কোথায় যাবে মা এর মধ্যে ?....ট্রামপর চড়িয়েগা কৈসে ?"

একটু আগাইয়া আসিলে দূরে মন্তব্য হইল—"সব উলটে গেল, আমাদের এঁরা পর্দা ঠেলে বেরিয়ে এলেন তো ওরা পর্দা সুদ্ধ্য নিয়ে বেরিয়ে এলো।"

একটা ট্রাম আসিল ; বেশই ভীড়, তবে এক একটা ট্রামে হঠাৎ যেমন হয়, উহারই মধ্যে একটু কম ; তিন জন বাঙালীর মেয়ে অপেক্ষা করিতেছিল, টপটপ করিয়া উঠিয়া পড়িল, পিছনে কয়েকজন পুরুষও উঠিল। খানিকটা জড়তা খানিকটা ভয় মিশিয়া চঞ্চলের পা দুইটাকে যেন উঠিতে দিল না। তাহার উপর ত্রস্ত ভীড়ের এলোমেলো একটু ধাক্কাও খাইল। আবার জুতার বাণ্ডিলটাকেও সামলাইতে হইতেছে বোরখার মধ্যে।...ট্রামটা চলিয়া গেল।

বোরখা না থাকিলে উঠিতে পারিত, অনুতাপে চঞ্চলের যেন নিজের

হাত কামড়াইতে ইচ্ছা করিতেছে। শুধু তাহাই নয় উল্টা অবস্থা দেখিয়া সে সত্যই মেয়েছেলের মতোই ভিতরে ভিতরে ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

বোরখাই কিন্তু উদ্ধার করিল। কয়েক জন লোকই তাহার এই ব্যর্থতা লক্ষ্য করিয়াছে, পরের ট্রাম আসিতেই জন তিনেক ছোকরা একেবারে হৈ-চৈ লাগাইয়া দিল—"বানকে—বেঁধে রাখো, লেডি হ্যায়—আপনি আসুন—আইয়ে আপ ইধার—একটু নেমে দাঁড়ান আপনারা—উঠতে দিন এঁকে, তার পর আবার উঠবেন মশাই—উনি দু'ঘণ্টা থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, পর্দানশীন জেনানা—চলে আইয়ে আপ—"

এক জন একটু বেশি কল্পনাপ্রবণ অথচ প্র্যাক্টিক্যাল গোছের ছোকরা বলিল—"ওঁর স্বামী হাসপাতালে—এখন-তখন এইরকম অবস্থা—"

একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। উপরেও কয়েক জন সহানুভূতিপ্রবণ হইয়া উঠিয়াছে। গাড়িটা ছাড়িতেই ঢং-ঢং-ঢং-ঢং করিয়া এলার্ম ঘণ্টি দিয়া দাঁড় করাইয়া দিল। ড্রাইভার গাল খাইল, কনডাক্টার দাবড়ানি খাইল। সেকেণ্ড ক্লাস থেকেও উৎসুক প্রশ্ন এবং সহানুভূতিসূচক কলরব উঠিল। যাহারা একটু জিদ করিয়া সিঁড়িতে দাঁড়াইয়াছিল বুকনির চোটে নামিতে যেন পথ পাইল না; দুইটি অগ্রণী ছোকরার পিছনে পিছনে চঞ্চল গিয়া ট্রামে উঠিল। যাহারা নামিয়াছিল, সবাই যে উঠিতে পারিল এমন নয়। অবশ্য তাহাদের জন্য আর কেহ এলার্ম দিল না। ট্রাম ছাড়িয়া দিল।

তাহার পর আর আটকাইল না। একে মহিলা তায় পর্দানশীন, তাহার উপর আবার ইহার জন্যই এতটা হৈ-চৈ হইয়া গিয়াছে, সেই চাপে ভীড়ের মধ্যেও কি করিয়া যেন আপনি আপনিই একটা রাস্তা হইয়া গেল।

অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে বুকনিও চলিতেছে ; দু'একজন বৃদ্ধও আছে, পাল্টা বুকনিও দিতেছে ;—"পর্দার মধ্যে থাকলেও জ্বালা, বেরুলেও জ্বালা.... বাড়ির অশান্তি থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ান যেত, এবার নাও বাইরে পর্যন্ত ঠেলে বেরুল।"

প্রায় সব আসন গুলাই মেয়ে দিয়া ভর্তি, বেটাছেলেদের মধ্যে যাহাদের নিজের নিজের জায়গা ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে, অপ্রসন্নভাবে রড্ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এদিকে চঞ্চলকে যাহারা তুলিয়া দিয়াছিল তাহারা উৎসাহিত করিতেছে—"আপনি আরও এগিয়ে যান—আরও...."

অন্য কয়েক জনও যোগ দিল—"আরও থোড়া বঢ় যাইয়ে মাঈ—একটু সরে দাঁড়ান না মশাই, দেখছেন...."

চঞ্চল গিয়া একটি বেঞ্চের পিছনে দাঁড়াইল। একটি যুবা আর একটি বৃদ্ধ। বৃদ্ধ ধারের দিকটায় একেবারে বাহিরের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া আছে ; মনে হয় যেন চরম বিরক্তিতে।

আবার টিপ্পনী, বক্রোক্তির ছুট আরম্ভ হইল।—"আপনারা দুজনে সীট দুটো ছেড়ে দিন না মশাই, দেখছেন পেছনে একজন ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে।—পাছে দেখতে পান, ফিরেও চাইছেন না, ও মশাই !...এ জাত আবার স্বরাজ চায় ! এখনও দুশো বছর !—"

যুবক বোধ হয় সত্যই অন্যমনস্ক ছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধ কিন্তু ফিরিয়াও চাহিল না। টিপ্পনীকারেরা আরও খানিকটা চেষ্টা করিল ; তাহার পর নিরস্ত হইল। বৃদ্ধ বলিয়াও আবার কেহ কেহ ভাবিল কালা। কেহ কেহ ভাবিল জানিয়া শুনিয়া কালা সাজিয়াছে, স্পষ্টভাষায় বলিলও, তাহাতেও কোন ফল না হওয়ায় শেষে চুপ করিয়া গেল।

তাহার পর পরামর্শ দেওয়া আরম্ভ হইল—"আপ উঠা বৈট যাইয়ে, বুড়া আদমি হ্যায় আপনার বাপের বয়সী লোক, বসে যান

না পাশে, কেন কষ্ট করে দাঁড়িয়ে থাকবেন? আপ উনকা লেড়কি মাফিক....”



...আপ উনকা লেড়কি মাফিক...

পরামর্শ এড়াইবার জন্যই চঞ্চল একবার আগাইয়া গিয়া বসিয়া পড়িল।

কী যে আরাম! কত দিন যে ট্রামে এভাবে বসিতে পায় নাই।

নূতন গাড়ি একটু গা দোলে না, গদি নরম যেন মনে হয় ফুলের ওপর বসিয়া আছে। এত যে ভীড়; প্রত্যেক স্টপেজেই ঠেলাঠেলি, হুড়াহুড়ি, বচসা, তাহার মধ্যেই এত নিশ্চিন্ত নির্লিপ্ত থাকায় যে কি আনন্দ! ট্রামের গতিটাও যে উপভোগ করিবার জিনিষ সেটা যেন ভুলিয়াই গিয়াছিল—সন্ সন্ করিয়া চলিয়াছে—সার্কুলার রোড ছাড়াইয়া চৌরঙ্গীতে পড়িয়া গতি আরও বাড়াইয়া দিল—বাঁ দিকে চার্চ, তার বাগান পাশে পুকুর—তারপরেই গড়ের মাঠ সবুজ—চলতি ট্রামের মধ্যে থেকে কতদিন এ সৌন্দর্য দেখে নাই! ভালো করিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া দেখিতে পারিতেছে না, বুড়ো হোক, তবু একটা পুরুষ মানুষই পাশে তো? তবু ঘাড় হেঁট করিয়া আড় চোখে জালতির মধ্যে দিয়া ঝাপসা ঝাপসা যাহা দেখিতেছে তাহাতেই যেন চক্ষু জুড়াইয়া যাইতেছে! আবার এত আরামের মধ্যে পথ বাহিয়া আজ ঠিক সময়ে আফিসে পৌঁছিবে! বড় বাবুকে আর ডাকিয়া আপ্যায়িত করিতে হইবে না—"বাপুহে আফিসে এভাবে চলবে না, কাল থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মেয়েদের ট্রামে ওঠা দেখো।"

—বোরখাটাকে যেন বুকে জড়াইয়া ধরিতে ইচ্ছা করিতেছে চঞ্চলের।

অত যে বুকে জড়াইয়া ধরিবার জিনিষ নয় সেটা কিছুক্ষণ পরেই টের পাইল। আফিসে পৌঁছিবার ঘণ্টাখানেক পরে পিয়ন আসিয়া খবর দিল বড় বাবু তলব করিয়াছেন। আজ হাজরির দিক দিয়া গলদ নাই, তবু বড় বাবুরই ডাক, চঞ্চল কুণ্ঠিত চরণে গিয়া টেবিলের সামনে দাঁড়াইল।

একটা ফাইল পড়িতেছিলেন, একবার চোখে তুলিয়া দেখিয়া লইয়া আবার পড়িতে লাগিলেন। শেষ করিয়া পাশে সরাইয়া রাখিয়া

বলিলেন—“আজ আসবার সময় ট্রামে আমার পাশটিতে একটি বোরখাপরা মেয়ে এসে বসল—”

চঞ্চলের পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেন একটা বিদ্যুতের শকে কাঁপাইয়া দিল, বড়বাবুর মুখ হইতে আর চোখ ফিরাইবার ক্ষমতা রহিল না। বড়বাবু খুব সহজ স্বরে বলিলেন—“খানিকটা গালমন্দও খাওয়ালে,—উঠলাম না কিনা আমি। আমাদের তো আর অত শিভ্যালরির বয়স নেই।—তার পর এই।” ফাইলের গাদা থেকে তুলিয়া আফিসের ছাপমারা একটা লম্বা লেফাফা চঞ্চলের হাতে দিলেন। চঞ্চলের মনে হইল পায়ের নিচে থেকে পৃথিবী যেন সরিয়া যাইতেছে। চাকরির অবস্থা খারাপ দেখিয়া কাল পকেটে করিয়া নিজের সার্টিফিকেটগুলা আফিসে লইয়া আসিয়াছিল, কয়েকখানা করিয়া কপি টাইপ করিয়া লইবার জন্য, আবার দরখাস্ত শুরু করিতে হইবে তো? কপি করিয়া আফিসের একটি লম্বা খামে পুরিয়া কোটের পকেটে রাখিয়াছিল।—তাহার পর থেকেই বোরখার স্বপ্ন। খামটা যে পকেটে থাকিয়াই গিয়াছিল সে খেয়ালও হয় নাই, এমন কি আফিসে আসিয়াও খেয়াল হয় নাই যে সেটা অন্তর্হিত হইয়াছে।

বড়বাবু বলিতে লাগিলেন—“আমার আগেই উঠল মেয়েটি, মনে হল যেন তার বোরখার মধ্যে থেকেই পড়ল, তার পর খামে নিজের আফিসের নাম দেখে মনে হ'ল আমার পকেট থেকেই পড়েছে বুঝি, তুলে নিলাম।—যাক, বেশি সময় নেই আমার, ব্যাপার কি ব'লে ফেল দিকিন বাপু চটপট। অবিশ্যি, বোরখার মধ্যে যে সত্যি একজন ভদ্রমহিলা ছিলেন, আর এত জিনিষ থাকতে ঘুরতে ঘুরতে তোমার সার্টিফিকেটগুলোই তাঁর হাতে গিয়ে পড়ল, এটা বিশ্বাস করতে বেশ একটু বাধে আর, তা যদি না হয় তো—”

বড়বাবু পাকা ভ্রূদু'টি তুলিয়া প্রশ্নের ভঙ্গিতে কয়েকবার মাথা দুলাইলেন। লজ্জায়, ভয়ে, কুণ্ঠায়, চঞ্চলের তখন সংকট অবস্থা, মরিয়া হইয়াই বলিল—"স্যার, আর লজ্জা দেবেন না, দয়া করে প্রকাশও করবেন না কথাটা, আমি নিজেই চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি—আজই রেজিগনেশনটা দিয়ে যাবো স্যার।"

* * *

আফিস বন্ধ হইবার কিছুক্ষণ আগে অর্ডার বুকে বড়বাবুর একটি নোটিশ বাহির হইল—For those who come from long distances half an hours delay in attendance may be condoned till conditions improve. (অবস্থার উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত, যাহারা বেশি দূর হইতে আসে তাহাদের আধ ঘণ্টা পর্যন্ত বিলম্ব মার্জনা করা যাইতে পারে।)

কাব্য

প্রায় মাসাবধি কাঁচা খাইয়া, পোড়া খাইয়া, অর্ধভুক্ত থাকিয়া, কোনো কোনো দিন বা একেবারে অভুক্ত থাকিয়া অনেক কষ্টে একটি পাচক-ঠাকুর জোগাড় হইল। নিজের হাত-দুখানির দিকে চাহিবার ফুরসৎ হইল একটু ; চোখ ফাটিয়া জল আসে ; পোড়া পেটের গোলামি করিতে কাটিয়া, হাজিয়া, পুড়িয়া একসা হইয়া গেছে ; কুটনা কোটা, ফেন গালা, ডাল সাঁতলানো, সবকিছু ঐ দুটির উপর দিয়াই তো গেল।

যাই হোক, লোকটি পাওয়া গেছে ভালো। প্রথমত, এখানকার লোক নয়। মাস-ছয়েক এখানে থাকিয়া যে অভিজ্ঞতা হইয়াছে তাহাতে স্থানীয় লোক রাখিবার আর প্রবৃত্তি নাই ; যেমন অলস, তেমনি অকর্মণ্য, আর বাড়ি যদি নিকটে হইল তো আমার এক মাসের ভাঁড়ার পনের দিনে নিঃশেষ করিয়া ছাড়িয়া দিবে ; শুধু চালডালই নয়, তেল, নুন, হলুদ, তেজপাতা কিছুই বাদ পড়িবে না। সমস্ত দোষ চাপাইবে ইঁদুরের উপর। যদি বলি, 'ইঁদুরের তেল নুন তেজপাতার সঙ্গে কি সম্বন্ধ?' উত্তর হইবে, আমি পুবের লোক, এখানকার ইঁদুরকে চিনি না।

দ্বিতীয় সুবিধা এই দেখিলাম, লোকটির বয়স হইয়াছে, পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ বছর হইবে। আশা করা গেল শখটখের বালাই থাকিবে না, আমার সাবান, মাজন, মাথার তেল অনেকটা নিরাপদ থাকিবে। তৃতীয় পাচক যে রাখিয়াছিলাম, পরে শুনিলাম, সে রাত্রে আমার সিল্কের পাঞ্জাবী আর পাম্প্‌-সু-জোড়া পর্যন্ত নিজের দখলে রাখিত। এ লোকটা সাদাসিধে, দাড়িগোঁফ মাথার চুল সব ক্ষুর দিয়া কামানো,

এদিকে বুকপিঠ কালো কালো কোঁকড়া চুলে ভরা ; অর্থাৎ চুলের যে বিভাগ লইয়া শৌখিনি করা চলিত তাহার গোড়া মারিয়া দিয়াছে, যে বিভাগ শৌখিনতার পরিপন্থী সেটাকে রাখিয়াছে জিয়াইয়া।

আর একটা কথা, লোকটার বাড়ি বলিল ছাতনার কাছে একটা গ্রামে। ছাতনা চণ্ডীদাসকে লইয়া টানাটানি করে। সত্যমিথ্যা যাই হোক, লোকগুলার মনে একটা ছাপ আছেই। কবির দেশের লোক, কেমন একটা শ্রদ্ধা হইল ; বিশ্বাস হইল অসময়ে দাগা দিবে না ; জিনিসটা মূলে তো একই, প্রেয়সীর দিকে গেলে বলি প্রেম, মনিবের দিকে গেলে বলি প্রভুভক্তি।

এর উপর একবেলা পরীক্ষায় বুঝিলাম, রাঁধেও খাসা।

২

বর্ষাকাল। এদিকে কটা দিন অসহ্য গুমট গিয়াছে, তাহার উপর স্বপাকের পালা ; গুমট, আগুনের তাত, তাহার উপরে আবার উদরেও হুতাশনের প্রদাহ, কি করিয়া যে কাটিয়াছে তাহা আর বলিয়া বুঝাইবার নয়। যাক, এবার বিধি প্রসন্ন। সকালেই গোপীনাথকে পাওয়া গেল। বেশ রাঁধিয়াছিল, রাত্রে আরও ভালো,—দেখিয়া-শুনিয়া লইবার সময় পাইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। নিশ্চিন্ততা, তাহার সঙ্গে পেট পুরিয়া ভালো আহার, গুমটের ভাবটা আর বুঝিতেই দেয় নাই। পরের দিনটি আরও চমৎকার। সকালে উঠিয়া দেখি কালো মেঘে সমস্ত আকাশ ছাইয়া গেছে, কোনোখানে এতটুকু ফাঁক নাই। তবুও কিন্তু বিরাম নাই, মেঘের এক-একখানা পাতলা স্তর খুব লঘুগতিতে পূর্ব থেকে পশ্চিমে উড়িয়া চলিয়াছে। বৃষ্টি আরম্ভ হয় নাই, মনে হইতেছে

আয়োজনে কোথাও যদি একটু ত্রুটি থাকিয়া গিয়া থাকে সেটুকু সারিয়া লইয়া একেবারে পূর্ণ উদ্যমে বৃষ্টি ঢালিবে,—মেঘমহলে তাহারই এই অতিব্যস্ততা। এতটুকু আওয়াজ পর্যন্ত নাই, ধীরসঞ্চারে সমস্ত আকাশপথ ব্যাপিয়া সারারাত ধরিয়া এতবড় আয়োজনটা হইয়াছে। রাত্রে এক আকাশ নক্ষত্র দেখিয়া শুইতে গিয়াছিলাম, সকালে চোখ খুলিয়াই মনে হইল, একটা জাদু হইয়াছে,—কোথায় ছিলাম, রাতারাতি কে আমায় অন্য কোথায় আনিয়া ফেলিয়াছে।

আমার বাসাটি ঠিক কাঁসাই নদীর ধারে। নদী, তাহার পরেই একটা বাঁধ, তাহার পরেই আমার বাসা। মাটকোঠা, তবে একটু নূতন ধরণের; ঘরের সামনে-পিছনে ওরই মধ্যে একফালি করিয়া বারান্দা-গোছের আছে। এটা দেখিতেছি এখানকার স্টাইল।...এদিকে শুকো গেছে, কিন্তু ছোটনাগপুরের পাহাড়ে নিশ্চয় বর্ষা নামিয়াছে; গৈরিক রঙের বেগচঞ্চল জলে কাঁসাই নদী টলটল করিতেছে। নদীর ওপার থেকেই ঢেউখেলানো জমি,—নামিয়া উঠিয়া নামিয়া উঠিয়া কতদূর চলিয়া গেছে—একেবারে বহুদূরে দক্ষিণ-পশ্চিমের দিকরেখা ঘেঁসিয়া কালো মেঘের নিচে তরঙ্গায়িত ঘননীলের রেখা—ময়ূরভঞ্জের পর্বতশ্রেণী।

বহুদিন পরে একটি মুক্ত আলস্যে আমার মনটি আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। সেদিন আবার আমার সাবরেজেস্টারি আপিসের ছুটি, তাহারই সঙ্গে সুর মিলাইয়া দিনটি দেখা দিয়াছে; একটি ক্যাম্বিসের চেয়ার বাহির করিলাম, তাহার উপর শরীরটা এলাইয়া দিয়া সামনে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দিলাম।....আগের দিনটি গোপীনাথকে আনিয়া দিয়াছিল, সেদিন আমি যেন নিজেকে নিজের কাছে ফিরিয়া পাইলাম। বেশ বুঝিতে পারিলাম, অবিরাম রান্নাঘরের চিন্তা আমার মধ্যেকার যে মানুষটিকে দেশছাড়া করিয়াছিল, মেঘসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে সে আবার

ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিতেছে। মনে একটা অপরিসীম ব্যাকুলতা জাগিয়া উঠিতে লাগিল, এমনকি মনে হইল, সদ্য-সদ্যই কাগজ-কলম লইয়া বসিয়া যাই।

গোপীনাথ চা লইয়া আসিল। আমার মন তখন এতটা তরল অবস্থায় যে ইচ্ছা হইল গোপীনাথের সঙ্গেও এই দিক্-প্রসারিত সৌন্দর্য লইয়া দুটো কথা কই। এইসব নির্বান্ধব দেশে যে-লোকটিকেই একটু কাছে পাওয়া যায় তাহার কাছেই যেন মনটাকে উন্মুক্ত করিয়া ধরিতে ইচ্ছা করে, বিশেষ করিয়া এইরকম দিনগুলিতে। কিন্তু ওর মুখের পানে চাহিয়া আর উৎসাহ রহিল না। মুখের প্রতি রেখাটি কঠিন, দৃষ্টি একেবারে ভাবলেশহীন, আর মাথার মাঝখান থেকে চিবুক পর্যন্ত সমস্ত মুখমণ্ডলটাই রান্নাঘরের ধোঁয়ায় পাকা। চাকরি লইবার সময় একটু দম্ভ করিয়া বলিয়াছিল, "আমরা সাতপুরুষ ধ'রে রাঁধা করচি, বাবুমশয়, ঈতে হটুবো নাই বটে।"

তবু চণ্ডীদাসের দেশের লোক, লোভ সম্বরণ করা গেল না, বলিলাম, "মেঘের অবস্থা দেখছ গোপীনাথ? কি মনে হয়?"

গোপীনাথ তাহার মাছের মতো ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, "কি মনে হয়—একটা কথা বটে।....আজ খিচুড়ি চাপাই, বাবুমশয়, দেবতা ঢালবে আজ্ঞে।"

এর পরে আর কিছু বলিতে প্রবৃত্তি হইল না।

গোপীনাথ কিন্তু আমার মনের তন্ত্রীটাকে বর্ষার সুরে যেন আরও ভালো করিয়া বাঁধিয়া দিয়া গেল। বিশ্বের যত বিরহিণী তাহাদের জন্য আমার মনটা আরও বেশি করিয়া আতুর হইয়া উঠিল। মনে হইল, জীবনের এই ট্রাজেডি,—বর্ষা আসে, নিঃসঙ্গ অন্তঃপুরে তার বেদনা জাগে, কিন্তু সে বেদনার প্রতিবেদন জাগে না কোনোখানেই।...বিশ্বের যত



"...আজ খিচুড়ি চাপাই, বাবুমশয়, দেবতা ঢালবে আজ্ঞে।"

পুরুষ সবাইকেই যেন আমার গোপীনাথ বলিয়া মনে হইল, কর্ম্মব্যস্ত, বিরস, এমন বর্ষার দিনেও তাহার মনকে দ্রব করিতে পারে না। পুরুষের

বিরহ লইয়া যত কাব্য সব আমার কাছে নিরর্থক অলীক বলিয়া মনে হইল। পুরুষের বিরহব্যথা বলিয়া কোনো অনুভূতি হয় না, খুব বেশি হয় তো একটা সাময়িক অভাববোধ, সাময়িক আর নিতান্তই শারীরিক।....আমি যেন স্পষ্ট দৃষ্টিতে দেখিলাম দেশ দেশ জুড়িয়া সমস্ত আকাশ ব্যাপিয়া বেদনার প্রলেপের মতো এই সুনিবিড় মেঘাবরণ, তাহারই ছায়ায় যত অন্তঃপুরের বাতায়নে যত প্রোষিতভর্তৃকার ব্যাকুল নয়ন;—এই আকাশের মতোই স্তিমিত, সজল। অথচ যাহাদের জন্য ব্যাকুলতা সেই পুরুষেরা কিন্তু সবাই নির্বিকার, তাহাদের অনবসর পরুষ জীবনে বর্ষা যদি নিতান্ত কোনো সুখস্মৃতির আলোড়ন তোলেই তো সে খিচুড়ির, তাহার বেশি ভাবিবার ক্ষমতাই নাই পুরুষের।

আমার মনে হইল মেঘদূতের যক্ষও আষাঢ়ের প্রথম দিনে প্রিয়ার হাতের খিচুড়ির কথাই ভাবিয়াছিল, সেই দুঃখ আর লজ্জার কথাটা চাপা দিতেই কবিবরের এত আড়ম্বর।

দুপুরের আগেই বৃষ্টি নামিল।

খিচুড়িই রাঁধিয়াছিল গোপীনাথ, আমার কাছে কোনো উত্তর না পাওয়ায় নিজের কেরামতি দেখাইবার জন্য বোধহয় বেশি মনোযোগ দিয়াই রাঁধিয়াছিল। বেশ পরিতৃপ্তিতে আহার করিয়া আমি বারান্দায় আসিয়া বসিলাম।

এখানে বর্ষার রূপই অন্যরকম। আমাদের ওদিকে ঘন গাছপালার জন্য এ-রূপটি খুলিতে পায় না, প্রতি পদেই বাধা পাইয়া বর্ষা যেন একটু বিকৃত হইয়া পড়ে। ধারাপাতও খুব প্রবল, একটি হালকা হাওয়ায় অল্প একটু তির্যক্ রেখায় নামিয়া আসিয়া ভূমিস্পর্শ করিতেছে, মনে হয় যেন ধারাগুলির আদি অন্ত সমস্তটাই দেখা যায়। ক্রমে শীকরবৃদ্ধির জন্য চারিদিক অল্প অল্প করিয়া ঝাপসা হইয়া আসিল, ক্রমে বেশি,—

দূরে ময়ূরভঞ্জ পাহাড়ের নীল রেখা মুছিয়া গেল, তাহারপর আরও কাছের ঢেউ-খেলানো জমি, তারপর কাঁসাইয়ের ওপারের তটরেখাও। কতক্ষণ গেল, কাঁসাইয়ের জল আরও উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। একসময় হাওয়াও উঠিল মাতিয়া, শুকোর সময় যেমন ধূলিরাশি লইয়া মাতামাতি করে ঠিক তেমনিভাবেই কুয়াশার মতো জলের কণা লইয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিল। একটুর মধ্যেই সমস্ত কাঁসাই নদীটাও দৃষ্টিপথ থেকে মুছিয়া গেল।

আমার মন থেকেও মুছিয়া গেল আর সবকিছুই, জাগিয়া রহিল শুধু এই বিক্ষুব্ধ বর্ষা আর যত বিরহিণীর হৃদয়ের এমনই বিক্ষুব্ধ বিরহ-বেদনা। কখন কাগজকলম আনিয়াছি, কখন লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি তাহার সাড়ও হয় নাই।....সমস্ত দিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি চলিল।

৩

যখন অকালসন্ধ্যার ছায়ায় চারিদিক মলিন হইয়া আসিয়াছে, একটি বিপর্যস্ত ছাতার মধ্যে ভিজিতে ভিজিতে ললিতবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি যেন হাতে স্বর্গ পাইলাম।

ললিতবাবু এখানকার স্কুলের গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক। থানা, সাবরেজেস্টারি আর স্কুল লইয়া আমাদের এই ক্ষুদ্র কলোনিটির মধ্যে এই একটি লোকের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা হইয়াছে—শুধু অন্তরঙ্গতা বলিলে সবটা বলা হয় না, আমরা এত নিগূঢ়ভাবে পরস্পরকে পাইয়াছি যে পরস্পরের ভরসাতেই এখানে টিকিয়া আছি বলা চলে।

প্রকৃত- রসিক আর দরদী লোক। এদিকে আমার সমবয়সী; যখনকার কথা হইতেছে তখন তাঁহারও বয়স ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের মধ্যে,

কাজেই আমাদের আলাপ-আলোচনা বা ভাবের আদানপ্রদানের মধ্যে কোনো অন্তরালের প্রয়োজন ছিল না।

পুলকিত হইলেও একটু বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম, "আজই চলে এলেন যে!"

হিন্দু-মুসলমানের পর্ব এবং আরও দু-একটা কি মিশাইয়া উঁহাদের স্কুলের সপ্তাহখানেকের ছুটি যাইতেছে; ললিতবাবু বাড়ি গিয়াছিলেন, ছুটি শেষ হয় নাই অথচ ফিরিয়া আসিয়াছেন বলিয়া প্রশ্নটা করিলাম।

ললিতবাবু ক্ষুব্ধকণ্ঠেই একটু হাসিয়া বলিলেন, "টুইশন আছে যে. মাস্টারের জীবন...."

হাতে পাইয়াও এমন বর্ষার দিনে যে নীরস উদরসংস্থানের জন্য ছাড়িয়া আসিতে হইল এর সমস্ত বেদনা ঐ কয়টি কথার মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিল; আমি একটা রসিকতা করিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু কথা বাহির হইল না। তাহারপর অবশ্য দু-একটা হালকা রহস্যালাপ হইল, কিন্তু প্রথম আলাপের ঐ বেদনাটুকুই আমাদের সব আলাপ-আলোচনার মূল সুর হইয়া রহিল সেদিন। হইবার কথাও তো,—বর্ষা আমার মনে ঐ সুর তুলিয়াছিল, ললিতবাবুও ঐ সুরেরই বেদনা বাড়ি থেকে বহন করিয়া আনিয়াছেন, সম্ভব কি ও সুরকে আসরছাড়া করা?

অন্য একটি ক্যাম্বিসের চেয়ারে ললিতবাবুও শরীর এলাইয়া দিলেন। প্রথমটা একটু আলাপের চেষ্টা চলিল, নিতান্ত সাধারণ প্রশ্নোত্তর, এই যে দুজনেই একভাবে অভিভূত হইয়া গেছি এটাকে যেন কতকটা চাপা দিবার জন্যই। তাহারপর মৌন দীর্ঘতর হইয়া উঠিতে লাগিল; তাহার পর অন্তর যখন কাঁসাই নদীর মতোই কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে, আমরা দুজনেই একেবারে মুখর হইয়া উঠিলাম। অন্য একটু কারণও ছিল, অন্ধকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের জগৎটা লুপ্ত হইয়া গেল

আমাদের কাছে, জাগিয়া রহিল শুধু হাওয়ার সন্‌সনানির সঙ্গে বর্ষণের শব্দ আর ভেকের কলরব মিলিয়া এক বিচিত্র ঐক্যতান।

আপিসের পিয়নটাই চাকরের কাজ করে, আলো দিয়া গেল। ললিতবাবু বলিলেন, "নাঃ, এমন রাত্রিটাকে 'সেলিব্রেট্' করতেই হবে শৈলেনবাবু, নৈলে আপসোস থেকে যাবে; আপনার কবিতার বইগুলো বের করুন, রবিবাবুর আর যার যার আছে। এসরাজটাও বাঁধুন।"

আমাদের রীতিমতো কাব্যে পাইয়া বসিল। গোপীনাথকে ডাকিয়া বলিয়া দিলাম, ললিতবাবু এখানেই আহার করিবেন।

৪

কিন্তু এটা আমার বর্ষার গুণকীর্তন নয়, কাব্যের বিড়ম্বনার ইতিহাস। সেই সিক্ত বর্ষারাত্রে কাব্যের হাতে অমন নিরবশেষভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া কি ভুলই করিয়াছিলাম এইবার সেইটুকুই বলিয়া শেষ করি।

রবীন্দ্রনাথ পড়া হইল, কবিবরের বর্ষার কবিতাগুলি আমার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই থাকে। ললিতবাবু সুকণ্ঠ—যেমন গানে তেমনি আবৃত্তিতেও, বর্ষার মন্দ্রের সঙ্গে ছন্দ আর ধ্বনি মিলাইয়া একটি একটি করিয়া কবিতাগুলি পাঠ করিয়া চলিলেন, আমি চক্ষু বুজিয়া নিজের সমস্ত সত্তাকে সেই দ্বৈত সংগীতের মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া দিলাম। রবীন্দ্রনাথ শেষ করিয়া অন্য কবিদেরও বাছা বাছা কবিতা পড়া হইল।...বাহিরে অন্ধকারের রন্ধ্র-রন্ধ্র সিক্ত করিয়া অবিরাম বৃষ্টির সঙ্গে বাতাসের শব্দ আরও জাগিয়া উঠিয়াছে, মনে হইতেছে, যত বিরহিণীর হাহাকার সঞ্চিত করিয়া লইয়া দিকে দিকে দিতেছে ছড়াইয়া। অন্য কবিদের শেষ করিয়া আবার রবীন্দ্রনাথে ফিরিয়া আসিলাম।

এ পর্যন্ত বোধ হয় তেমন ক্ষতি হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ শেষ করিয়া বৈষ্ণব কবিদের লইয়া পড়িয়াছি, কয়েকটি পড়া শেষ হইয়াছে, ললিতবাবুর আবৃত্তির মধ্যে গীতের আমেজ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে, এমন সময় গোপীনাথ্ আসিয়া প্রশ্ন করিল, "আয়োজন করা হবেক, আজ্ঞে?"

আমরা আলো-জ্বালার পরই ঘরে আসিয়া বসিয়াছি; মনে হইল যেন গোপীনাথ খানিকক্ষণ থেকে বারান্দায় অপেক্ষা করিতেছিল। বোধ হয় আমাদের পড়ায় বাধা দিবে কিনা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না, তাহার পর যখন দেখিল বৈষ্ণব কবিদের পালা আরম্ভ হইয়া একটু একটু সুরের রেশ জাগিয়া উঠিতেছে, বেশি বিলম্বের আশঙ্কা করিয়া আর অপেক্ষা করিল না, নোটিসটা দিয়া দেওয়াই ঠিক করিল। অবশ্য এটা আমার আন্দাজ। আমি ললিতবাবুর পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিলাম, "কি বলেন, দেবে?"

বেশ একটু রসভঙ্গ হইয়া গেল। ললিতবাবু আমার পানে চাহিয়া একটু হাসিলেন মাত্র। একটু আগেই তাঁহাকে গোপীনাথের খিচুড়ি-রসিকতার গল্প করিয়াছি; ওঁর হাসিতে যেন এইটুকুই স্পষ্ট হইল, 'আপনিও শেষে গোপীনাথ হইয়া গেলেন?'

গোপীনাথকে বলিলাম, "আমাদের এখন দেরি হবে, তুমি ঢাকাঢুকি দিয়ে ঘুমোতেও পার নিশ্চিন্দি হয়ে, ডেকে নোব'খন।"

গোপীনাথ প্রশ্ন করিল, "দোরটা ভেজিয়ে দেওয়া করব আজ্ঞে? জলের ছিটে আসচে বটে।"

বলিলাম, "তা বরং দাও।"

গোপীনাথ চলিয়া গেলে ললিতবাবু বলিলেন, "এবার—আপনার এসরাজটা নামান।"

সুরে-মূর্ছনায় কাব্য এবার সংগীতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। ললিতবাবু শুরু করিলেন, "এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর—"

পুরাতন গীত, অতিগীত হওয়ার জন্য বোধ হয় আরও পুরাতন; কিন্তু মনে হইল যুগ যুগ অতিক্রম করিয়া এ সেই প্রথম দিনটিতে চলিয়া গেছে যেদিন কবি নিজে রচনা করিয়া, মনের সমস্ত দরদটুকু নিংড়াইয়া নিজের কণ্ঠে গাহিয়াছিলেন। ললিতবাবুর গলাও কোনো দিন এত মর্মন্তুদ হইয়া ওঠে নাই, মনে হইল রজনীর সমস্ত বিরহব্যথা দেখিতে দেখিতে গুটিকতক শব্দের মধ্যে মূর্তি ধরিয়া উঠিল।

বোধ হয় এতেও ততটা ক্ষতি ছিল না। ললিতবাবু এর পর ভাটিয়ালি ধরিলেন একটা। গানের আগে, কতকটা মনের আবেগে একটু ভূমিকা ও করিলেন, বলিলেন, "শৈলেনবাবু, আমার এক একবার মনে হয় ভাটিয়ালিই শ্রেষ্ঠ সংগীত,—সংগীতই বলুন বা কাব্যই বলুন; ও যেন নদীর তীরের আপনি-হওয়া, আপনি-বেড়ে-ওঠা লতাটি; আপনার কি মনে হয়?"

সত্যই, গান যেন একেবারে মুক্ত বুকের ব্যথা লইয়া মাঠের ভাষায়, মাটির ভাষায় নিতান্ত সহজ লীলায় জাগিয়া উঠিল। অন্ধকারে ঢাকা চারিদিককার এই মুক্ত প্রকৃতির সঙ্গে, এমন কি আমার এই মাটকোঠা-টুকুর সঙ্গে ছন্দে সুরে যেন মিলিয়া গেছে। এ জায়গার প্রাণের সঙ্গে এমন করিয়া মেশানো আর অন্য কিছুই যেন হইতে পারিত না।.... 'বন্ধু গো, তুমি কাজের জন্যে খেয়া পেরিয়ে পারে গেলে, সন্ধ্যে হয়ে এল; একটা নদী মাঝে থেকেই আমাকে পাগল করে দিয়েছিল, এখন আর-একটা নদী মাঝখানে এসে গেল—এই বর্ষা; কি করি আমি বন্ধু, কোথায় যাই?....'

এত স্পষ্ট, সহজ কান্না আর হয় না। মানুষের সেই আদিম কান্না,

ভাষার আড়ম্বর যাহাকে আবিল করিয়া ফেলিতে পারে নাই। সেই আদিম নিরাভরণ ব্যথার সুর, কুটির থেকে প্রাসাদ পর্যন্ত সবার বুকেই যাহা এক থাকিয়া গেছে, আর অনন্তকাল ধরিয়া থাকিবে। যাহাকে চিনিয়া লইতে এক মুহূর্তও দেরি হয় না।

বর্ষার সংগতে বিনাইয়া বিনাইয়া, সমস্ত দিনের সঞ্চিত আবেগ নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়া গাহিয়া চলিলেন ললিতবাবু। যখন শেষ হইল রাত্রি প্রায় বারোটা।

গোপীনাথকে জাগাইতে বেগ পাইতে হইল না। জোরে দু'একটা হাঁক দিতেই দুয়ার খুলিয়া চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে আসিয়া উপস্থিত হইল; চোখ দুইটা লাল হইয়া গেছে। খাবার দিতে নামিয়া গেলে ললিতবাবু বলিলেন, "বেচারার প্রতি অত্যাচার হয়ে গেল একটু, ঘুমিয়ে পড়েছিল, আজই অতটা পথ হেঁটে এসেছে।"

আহারের সময় ললিতবাবু গোপীনাথের রান্নার অজস্র প্রশংসা করিলেন, বলিলেন, "দেরিতে পেলেন, কিন্তু ভালো লোক পেয়েছেন শৈলেনবাবু, ছাড়বেন না।"

বলিলাম, "আর খিচুড়ি যা রাঁধে! কাল সকালে এখানেই খাবেন ললিতবাবু, যেমন দেখা যাচ্ছে বৃষ্টি ধরবে না, খিচুড়ি খাবার দিনই থাকবে।"



৫

সকালবেলা, একরকম ভোরেই, নিজেকেই ছাতা মাথায় দিয়া ললিতবাবুর বাসায় গিয়া উপস্থিত হইতে হইল। বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিলেন, "হঠাৎ এ দুর্যোগে!—নেমন্তন্নের কথা মনে করিয়ে দিতে এলেন৷ নাকি মশাই? বামুন যে সেটা মনে নেই?"

বলিলাম, "না, নেমন্তন্ন নিতে এলাম। ওদিকে আজ অষ্টরম্ভা।"

ললিতবাবু অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, "মানে?"

বলিলাম, "গোপীনাথ উধাও। কাল আমরা কাব্য করেছি আর ও বেটা বারান্দায় বসে বউয়ের কথা ভেবে ভেবে হাপুস নয়নে কেঁদেছে। নেহাৎ যেগুলো সাহিত্যিক কবিতা সেগুলোতে ততটা ক্ষতি হয়নি নিশ্চয়,—কাল করেছে আপনার ভাটিয়ালিতে।....সকালে খোঁজ করতে পিয়নটা বললে—এই রকম ব্যাপার, ক্রমাগতই নাকি চোখ মুছেচে আর বলেছে বাড়ির জন্যে মন কেমন করছে।....পালাবেই যে, পিয়নটা অতটা আন্দাজ করতে পারে নি। বউটা নাকি আবার দোজপক্ষের..."

ললিতবাবু বিস্মিতভাবেই বলিলেন, "তবে যে বললেন, নেহাৎ বেরসিক কাটখোট্টা-গোছের।"

দুঃখে হাসিয়া বলিলাম, "খুঁচিয়ে রস বের করেই যে বিপদ ডেকে আনা গেল মশাই। নইলে ও-বেটার সাতপুরুষেও বিরহ কাকে বলে জানে না। ভাটিয়ালিতেও আতঙ্ক ধরিয়ে দিলে। আপনারটাও পালায় নি তো? এখানে এসে আর গানটান গেয়েছিলেন?"

ললিতবাবু বলিলেন, "আমারটা বুড়ো।"

বলিলাম, "তবু গানটান একটু সমঝে-বুঝে গাইবেন, মশাই, বর্ষার এ-কটা দিন,—কখন কি অঘটন ঘ'টে বসে বলা যায় না, দেশটা একটু বেয়াড়া-গোছের যেন।"

যুদ্ধের হিড়িকে

লোকেরা কলিকাতার ট্রাম-বাসের অবস্থা এখন প্রত্যক্ষ করিতেছে; লড়াইয়ের হিড়িকে, ভীড়ে, তাড়াহুড়ায় মানুষের মনের অবস্থা কি রকম দাঁড়াইতেছে তাহারও নমুনা দেখিতেছে, তবু বোধ হয় এই কাহিনীটি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিবে, ইহার পর তো একেবারেই বিশ্বাস করিতে চাহিবে না।

একত্রিশ নম্বর বাস, শ্যামবাজার হইতে দমদম স্টেশন হইয়া গৌরীপুর যায়। দমদমে রেল গাড়িতে আমার একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করিতে হইবে, তাহারপর সেই গাড়িতেই তাঁহার সঙ্গে কাঁচড়াপাড়া যাইবার কথা। যে বাসটি ছাড়িবার মুখে তাহাতে জায়গা পাইলাম না, পিছনেরটিতে আসিয়া বসিলাম। ইহাতেও গুটিকয়েক যাত্রী জুটিয়াছে, তাহাদের মধ্যে তিন জন স্ত্রীলোক। দুই জন দুই-সীটওলা একটি স্ত্রীলোকদের বেঞ্চ দখল করিয়া বসিয়াছে। তৃতীয়টি একটি আন্দাজ তের-চৌদ্দ বছরের মেয়ে, একটি ঝকমকে শাড়ি পরা, বুকের উপর পর্যন্ত ঘোমটা-টানা, পাশের দিকের লম্বা জেনানা সীটটাতে বসিয়া আছে, পাশেই একটি প্রায় ছাব্বিশ-সাতাশ বৎসরের যুবক;— সন্দেহ থাকে না, তাহার স্বামীই। নিম্নশ্রেণীর বলিয়াই মনে হইল: যুবকের রঙটা অত্যধিক কালো, গাল রগ বসা, সস্তা পরিচ্ছদে রঙের বেশ একটু আতিশয্য আছে। স্ত্রী সম্বন্ধে বেশ একটু ঈর্ষার ভাব আছে যুবকের,—একে তো লম্বা ঘোমটা টানাইয়াছে, যা আজকাল একেবারেই অচল, তাহার উপর কেহ নজর দিতেছে কিনা লক্ষ্য করিবার জন্য মাঝে মাঝে চঞ্চল ভাবে ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে আর

হাতের তেলো দিয়া গোঁফ-জোড়া উপর দিকে তুলিয়া তুলিয়া দিতেছে। হালকা, আছাঁটা একজোড়া গোঁফও আছে।....বয়স কম হোক, কিন্তু লোকটা মনের দিক দিয়া ও আবার এদিক দিয়াও কতকটা সেকেলে। নূতন বিবাহ বলিয়াই মনে হয়, সম্ভবত জোড়ের পর এই প্রথম বৌকে বাড়ি লইয়া যাইতেছে।

দেখিতে দেখিতে এ বাসটাও আগেকার মতোই ভর্তি হইয়া গেল এবং যখন স্টার্ট দিল তখন অতিরিক্ত ভীড়ের জন্য ভিতরে রীতিমতো বচসা আরম্ভ হইয়া গেছে। সব শেষে যে উঠিবার চেষ্টা করিতেছিল কোনরকমে ডান পায়ের গোটা-তিনেক আঙুল পা-দানিতে আটকাইয়া একেবারে নিচের লোকটিকে একটু জায়গার জন্য মিনতি করিতে করিতে একটু অগ্রসর হইল, তাহারপর নামিয়া পড়িয়া গালাগালির সঙ্গে তাহাকে ঘুষি দেখাইতে দেখাইতে পিছনকার বাসে গিয়া উঠিল।

তাহারপর আরও লোক উঠিল; লোক দেখিলেই ড্রাইভার গতিবেগ কমাইয়া দিতেছে, কনডাক্টার তাহাকে বাঁ-হাতে ধরিয়া ভিতরে ঠেলিয়া দিয়া বলিতেছে—"ঠিক হ্যায়!" আবার বাসের গতিবেগ বাড়িয়া যাইতেছে। লোকেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছে, আগন্তুকের সঙ্গে বচসা করিতেছে। কনডাক্টারকেও কড়া কড়া শুনাইতেছে, কিন্তু ফল হইতেছে না। এই করিয়া করিয়া বারাকপুর রোডের খানিকটা আসিয়া একটা মস্ত বড় বাধা উপস্থিত হইল: কতগুলি মিলিটারি লরি রাস্তা অতিক্রম করিতেছিল, বাসটাকে দাঁড়াইয়া যাইতে হইল। লম্বা গাড়ির শ্রেণী, প্রায় মিনিট দশেক বিলম্ব হইয়া গেল।

এর পরেই বাসের নীতি একেবারে বদলাইয়া গেল। বিলম্বের জন্য মিনিট-পিছু মোটা জরিমানা দিতে হয়, নূতন যাত্রী তো লইলই না, কয়েকজন নামিবার জন্য কয়েক জায়গায় চেঁচামেচি করিল, কিন্তু

তাহাতেও কিছুমাত্র কর্ণপাত না করিয়া কনডাক্টার একেবারে দমদম ফ্যাক্টরির সামনে লইয়া গিয়া বাসটা দাঁড় করাইল। যাহাদের গন্তব্য ছাড়াইয়া আসিয়াছিল তাহারা একচোট খুব হল্লা করিল, ড্রাইভার কনডাক্টারের নাম জিজ্ঞাসা করিল, বাসের নম্বর লইল, তাহারপর দুইজনের মধ্যে কাহাকেও কিছুমাত্র বিচলিত করিতে না পারিয়া একে একে চলিয়া গেল। অনেক লোক নামিল এখানে, বোধ হয় তাহার চেয়ে বেশি আবার উঠিল ; এই সবের দরুন গোলমালটা একটু থিতাইলে, হঠাৎ নজরটা ফ্যাক্টারির ওদিকে গিয়া পড়িল।—

একটা বোধ হয় দুর্ঘটনা হইয়াছে। রাস্তার একটু ধার ঘেঁষিয়া অনেকগুলা লোক জটলা করিতেছে, মাঝখানে একটা ঘোড়ার গাড়ি। পরক্ষণেই দেখি একটি মেয়ের হাত ধরিয়া একরকম টানিতে টানিতে একটি বেঁটে-সেঁটে গোছের মাঝবয়সী লোক ভীড় ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে,—মাথায় টাক, মোটা একজোড়া গোঁফ, খোঁচা খোঁচা দাড়ি। মেয়েটির পরনে একখানি ভালো শাড়ি, এদিকে একগলা ঘোমটা টানা, পায়ে নূতন জুতা ; টানিয়া আনার জন্য, অনভ্যাসের জন্য এবং ঘোমটার জন্য কতকটা ল্যাংচাইতে ল্যাংচাইতে লোকটির অনুসরণ করিতেছে। পিছনেই একটা ছোঁড়ার মাথায় একটা মাঝারি সাইজের নূতন ট্রাঙ্ক। ভদ্রলোক মেয়েটির হাত ধরিয়া আছেন মাত্র—তা অবশ্য বেশ কষিয়াই—এর অতিরিক্ত আর তাহার দিকে খেয়াল নাই, মনে হইতেছে যদি পড়িয়া যায় তো সেই অবস্থাতেই হিঁচড়াইতে হিঁচড়াইতে লইয়া আসিবেন, এদিকে অন্য হাতটা তুলিয়া বাসটার দিকে চাহিয়া পরিত্রাহি চিৎকার করিতেছেন—"বান্‌কে! বান্‌কে! বান্‌কে ড্রাইভার! লেডিজ্!"

আসিয়াই প্রথমে মেয়েটিকে পা-দানিতে তুলিয়া দিলেন। কাহার



"বান্‌কে! বান্‌কে! বান্‌কে ড্রাইভার! লেডিজ্‌!"

ঘাড়ে তুলিতেছেন, জায়গা আছে কিনা, পথ আছে কিনা, কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নাই। মেয়েটি জড়সড় হইয়া কোন রকমে আটকাইয়া গেলেই তাহাকে সেই অবস্থায় ছাড়িয়া ট্রাঙ্ক সুদ্ধ ছোঁড়াটাকে টানিতে টানিতে সামনের দিকে লইয়া গেলেন। কনডাক্টার একটু ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া সঙ্গে সঙ্গে যাইতে যাইতে বলিল—"এক রুপেয়া মাসুল লাগেগা!"

"আট আনা"—বলিয়া নিজেই দোরের হ্যাণ্ডেলটা ঘুরাইয়া ছোঁড়াটার মাথা সুদ্ধ সাঁদ করাইয়া ট্রাঙ্কটা ড্রাইভারের পাশে রাখিয়া দিলেন। একটু দর কষাকষি করিয়া বারো আনায় রফা হইল।

অবস্থা দেখিয়া ওই ভীড়েও কয়েকজন নামিয়া দাঁড়াইয়া মেয়েটিকে পথ করিয়া দিয়াছিল। একটু ভিতরে আসিতে আমরাই কয়েকজন মিলিয়া তাহাকে মেয়েদের বেঞ্চে বসাইয়া দিলাম। জায়গা ছিল না, তবে সেই যে যুবকটি তাহার কনের পাশে বসিয়াছিল, তাহাকেই উঠাইয়া জায়গা করা হইল। প্রথমে রাজিই হয় না, মুখ গোঁজ করিয়া বসিয়া রহিল; তাহার পর নিতান্ত নাচার হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাতের তেলো দিয়া গোঁফ দুইটি উপরে তুলিয়া দিতে লাগিল।

কনডাক্টার বলিল—"ঠিক হ্যায়!" বাস ছাড়িয়া দিল।

এমন সময় ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে অবশ্য কেহ পথ করিয়া দিল না, তবুও ঠেলিয়া-ঠুলিয়া ঠিক উঠিয়া আসিলেন, মাঝপথ থেকেই চেঁচাইয়া বলিলেন—"কোথায়? আমি যে তুলে দিয়ে গেলুম।"

আমিই সামনে ছিলাম, বলিলাম—"ঐ বসেছে; তুলে তো দিলেন, কিন্তু উঠতে পারলো কিনা দেখলেন না তো—"

"দেখবার সময় আছে মশাই? ওদিকে আবার ট্রাঙ্ক, তারপর আবার বাড়ি পৌঁছে দিয়েই ছোট্ শ্যামনগর। কোন দিকে ঘুরে দেখবার জো আছে দ্বিতীয়বারটি? কি যুগটা পড়েছে দেখছেন না?"

বলিলাম—"তবুও, একটা ছেলেমানুষ মেয়ে—এই ভীড়....এক্সিডেণ্ট হয়েছিল নাকি?"

ভদ্রলোকের গতিবিধি খুব সন্ত্রস্ত আর কথাবার্তা খুব দ্রুত; চারিদিকেই যেন বেসামাল হইয়া যাইতেছে, সবই যেন তাড়াহুড়া করিয়া কোনরকমে সারিয়া লইতে হইবে, ভাবটা এই রকম। বলিলেন—"ওকে এক্সিডেণ্ট বলে না, যমের মুখ থেকে ফিরে আসা মশাই। ওই সেই মিলিটারি লরি—দেখছেন তো কি কাণ্ডটা করছে রোজ?—ঠিক গুছিয়ে ধাক্কাটি দিতে পারলে না, একখানি চাকা ছুঁয়ে গেল, নৈলে আর এখানে দেখতে পেতেন না—ছুঁয়ে যাওয়াতেই কি অবস্থাটি করে গেছে একবার নেবে দেখে আসুন না—বলে, বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা! আজকাল কি আর মেয়েছেলে নিয়ে বেরোয় মশায়? আবার না বেরিয়েই বা উপায় কি বলুন?—উটি ছেলের বৌ।....এখন বিয়েটা না করলেই পারতিস—লড়াইয়ের চাকরি, একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক—আমি সেই কথাই বলেছিলাম মশাই, তা ভেতরের কথা কি জানেন?"

মেয়েটি পাশেই ঘোমটা টানিয়া বসিয়া, মাথাটা একটু নিচু হইয়া গেল। ভদ্রলোকের সে দিকে লক্ষ্য নাই, গ্রাহ্যও নাই; বলিয়া চলিলেন—"ভেতরের কথা হচ্ছে সেখানে চিঠি পাওয়া চাই...."

মেয়েটি মাথাটি একেবারে নিচু করিয়া যেন গুটাইয়া গেল। ভদ্রলোক কিন্তু কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আমার পানে চাহিয়াই বলিলেন—"আশ্চর্য হচ্ছেন? বিশ্বাস করছেন না? অবিশ্যি আমাকে কি আর বলেছে? হাজার মিলিটারি মেজাজ হোক, বাপই তো?—বলেছে—

মানে লিখে পাঠিয়েছে তার ভাজকে—সেখানে আর সব বন্ধুবান্ধবের চিঠি আসে, ঘটা করে পড়ে সবাই মিলে....”

আমি কেন আশ্চর্য হইয়াছি, ভদ্রলোকের বোধ হয় এতক্ষণ পরে হুঁস হইল। একেবারে ও প্রসঙ্গটা ছাড়িয়া দিলেন। বুঝিলাম সেই ধরণের লোক যাহারা যাহা ভাবে ভিতরের ব্যস্ত অন্যমনস্ক ভাবের জন্য তাহাই প্রকাশ করিয়া ফেলে। ভদ্রলোক একটু যেন অপ্রস্তুত থাকিয়া চুপ করিয়া রহিলেন, তাহারপরেই আবার আরম্ভ করিয়া দিলেন—“বেশ, বে করবি তো ছুটি নিয়ে আয়, দেখ, পছন্দ কর—আজকাল তো ঐ সব হয়েছে—আমরা তো ওল্ড্ ফুলের দলে—তা ছুটি পেলেন মাত্র পাঁচটি দিনের—আরে মশাই, তোমার বিয়ে, সেজন্যে তারা তো লড়াই বন্ধ করতে পারে না....”

বাস লেট হইয়া গেছে,—আগেকার মতই কয়েকটা স্টপ্ বাদ দিয়া লোকেদের চেঁচামেচি, গালাগালি, হুমকির মধ্যে এক জায়গায় গিয়া নির্বিকারভাবে দাঁড়াইল। কিছু লোক নামিল।—“আগে হোইয়ে বড়াবাবু—সামনে বহুত জায়গা আছে”—বলিতে বলিতে কনডাক্টার,—যত নামিল তাহার চেয়ে বেশি লোক ঠেলিয়া উঠাইল। ড্রাইভার দেরির জন্য জোর তাগাদা আর বকাবকি লাগাইয়াছে, ভদ্রলোকও ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন—“দেখুন কাণ্ড বেটাদের! আমায় বাড়ি পৌঁছে আবার পরের গাড়িতে শ্যামনগর দৌড়ুতে হবে মশাই....”

গল্পটা আবার আরম্ভ করিতে যাইতেছিলেন এমন সময় রাস্তায় একটা হৈ-চৈ উঠিল।

একটা লোক চেঁচাইতে চেঁচাইতে দুই হাতে একটা ট্রাঙ্ক ধরিয়া একটু কুঁজো হইয়া ছুটিয়া আসিতেছে। আমি জানালার মধ্যে দিয়া দেখিয়া ভদ্রলোককে বলিলাম—“আপনার ট্রাঙ্কটা মনে হচ্ছে যেন।”

"তা হবে, আশ্চর্য হবার কি আছে ?"—বলিয়া ভদ্রলোক একটু ঝুঁকিয়া স্বর লক্ষ্য করিয়া বাহিরের দিকে চাহিলেন। বাস দাঁড়াইয়াছে, লোকটি—"বদলি হো গিয়া ! বদল হয়ে গেছে !" বলিতে বলিতে সামনের দিকে লইয়া গেল। কনডাক্টার দোরটা খুলিয়া দিল, তাহার নির্দেশ মত অন্য একটা ট্রাঙ্ক বাহির করিয়া দিল, নির্লিপ্ত ভাবে—"ঠিক হ্যায় !" বলিয়া পা-দানে উঠিয়া পড়িল, আবার বাস ছাড়িয়া দিল।

আশ্চর্যের কথা, ভদ্রলোক একটা কিছুও বলিলেন না, ঝুঁকিয়া সমস্ত ব্যাপারটি পূর্বাপর দেখিয়া লইয়া বাস ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার পূর্ববৎ সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন। আমিই বলিলাম—"ঠেলে ঠুলে একটু এগিয়ে যান মশাই, যা ভীড়, গোলমাল, নিজের জিনিসের ওপর একটু নজর রাখা দরকার, এখুনি তো গেছল !"

ভদ্রলোক একটু ব্যঙ্গের স্বরে আমার পানে চাহিয়া বলিলেন—"তারপর ? না হয় এগুলাম, তারপর ? আমি ট্রাঙ্ক আগলাচ্ছি আর ইটিকে যদি কেউ ওমনি গোলমাল ক'রে হাত ধরে নামিয়ে নিয়ে যায় ? যা অবস্থা পড়েছে, অসম্ভব ?....সময়টাই যে এই রকম পড়েছে মশাই, লোকের মাথার ঠিক আছে, না, লোকে ভেবে-চিন্তে, থিতিয়ে-জিরিয়ে কোন কাজ করতে পারছে ? যেতো ট্রাঙ্কটা যেতো, যায় যাবে, গুন্‌তিতে ঠিক থাকতো তো ?—একটা নিয়ে সোনামুখ করে বাড়ি উঠতুম, তা ভিন্ন করছি কি বলুন না। আর গুন্‌তিতেও যদি নাই ঠিক থাকতো, মারামারি করতুম ? মকদ্দমা করতুম ? বলুন ?"

ওদিকেও নানারকম বচসা চলিতেছে—তাহারই মধ্যে কনডাক্টার নির্লিপ্ত ভাবে টিকিট বেচার সঙ্গে সঙ্গে সাধ্যমত নূতন জায়গা সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিতেছে। কালো যুবকটিকে অনুনয় করিয়া বলিল

—“আপনি দু'পা এগিয়ে যান বড়বাবু দয়া কোরে, বহুত জায়গা আছে।”

খালি আছে সামনে অল্প একটু, যুবক একবার ঘাড় ফিরাইয়া বধূটির পানে চাহিল, কনডাক্টার তাহাকে আলগা ভাবে একটু ঠেলিয়াই বলিল—“লেডিজদের জন্যে ভাবনা কোরবেন না বড়বাবু; কোই আর বোসবে না… ”

বাসের ঝাঁকানির সঙ্গে ঠেলা খাইয়া যুবক খালি জায়গাটায় গিয়া পড়িল, হাতের তেলো দিয়া গোঁফ জোড়াটা তুলিয়া দিতে দিতে আর একবার ফিরিয়া চাহিল; ক'টা ঝোঁকে বেশ খানিকটা আগাইয়া গেছে।

আমার নজরটা একটু ঐদিকে গিয়াছিল, ভদ্রলোক উত্তরের জন্যে তাগাদা দিলেন—“বলুন না, মারামারি করতুম? মকদ্দমা করতুম?”

পাশেই একজন বৃদ্ধগোছের ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন, বলিলেন—“মারামারি মকদ্দমার কথা নয়; নিজের জিনিসের ওপর নজর রাখলে….”

“ঐ তো দেখে শুনে নিজের জিনিস নামালে মশাই, হয়ে গেল পরের, ঘাড়ে করে আবার ছোট!….বলুন?”

কোণঠাসা করিয়া নিজেই আবার সুরাহা করিলেন, বলিলেন—“তা নয়, এই রকমই হবে, হচ্ছে,—সময়টা চলেছে কি রকম দেখতে হবে তো? কারুর কি মাথার ঠিক আছে? এখন গুনতি-মাফিক ঘরে কোনরকমে তুলতে পারেন তো বাহবা; কি তুললুম, কেমন করে তুললুম তা কি আর ভেবে দেখবার অবসর আছে মানুষের?….আর সব বাদ দিন, চালটা যে ঘরে তুলছেন—কিউ, আর, এস, টি—একেবারে জেড্ পর্যন্ত লাইন করে দাঁড়িয়ে,—দিব্যি করে বলবেন যে সেটা চালই?”

দ্বিতীয়বার কোণঠাসা হইয়া বৃদ্ধ মুখটা ঘুরাইয়া লইতে লইতে বলিলেন—"ভালো কথা বললুম—নিজের মালের ওপর একটু নজর রাখতে, তা...."

ভদ্রলোক আবার আমায় সাক্ষী মানিয়া আরম্ভ করিলেন—"কি মশাই? চাল বলে ডাহা কাঁকর ঘরে তুলছি তো? আঁতে পর্যন্ত সেই জিনিস চালান হচ্ছে তো? ওই ধরে থাকতে হবে, সময়টা যে ওই যাচ্ছে।....বাড়িতে গিয়ে গিন্নিকে দু'টি জিনিস গচিয়ে দিতে হবে—'এই তোমার ট্রাঙ্ক, এই তোমার বৌ';—এখন ঢাকনার মধ্যে কার কি আছে...."

বৃদ্ধ মুখ ফিরাইয়া লইলেও এদিকে কান পাতিয়া রাখিয়াছিলেন, মাথাটা ঘুরাইয়া গোঁফ ফুলাইয়া বলিলেন—"তা'হলে ঘোমটার মধ্যে কার বৌ আছে সে দায়িত্বও..."

ভদ্রলোক চোখ মুখ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—"নেই-ই তো মশাই। কোন জিনিসটা কায়দা-মাফিক হতে পাচ্ছে যে দায়িত্ব থাকবে?..."

বৃদ্ধ আবার মুখ ফিরাইয়া লওয়ায় পুনরায় আমাকেই সাক্ষী মানিলেন, তবে বেশ আর একটু বিচলিত হইয়া উঠিয়াছেন; ঘোমটার মধ্যে মেয়েটি গুটাইয়া কোথায় ঠাঁই লইবে যেন বুঝিতে পারিতেছে না। বলিতে লাগিলেন—"না হলে ছেলের এই বে করবার সময় হোল? চিঠির জন্যে কাউকে বে করতে শুনেছেন?....তারপর এক বাড়িতে একদিনে তিনটে বে মশাই—ইয়েস, থ্রি! —দু'টি জামাই মিলিটারি!... একটির ভোর চারটেয় ট্রেন—মিলিটারি স্পেশ্যাল, ঝাঁসি! বাসরঘরের বালাই নেই, বিয়ের পরে কুশুণ্ডিঙের মস্তর আওড়াতে আওড়াতে ছোট ইস্টিশান!...বলুন, পদ্ধতি মতন কাজ হয় এতে? কে জানে মশাই কার কনে কার ঘাড়ে পড়ল এই ডামাডোলের মধ্যে?....আমারই কেস্ ধরুন

না—জোড়ের পর বৌ এই প্রথম শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে, ছেলেরই নিয়ে যাবার কথা তো ?—না, ছোট্ট বুড়ো তুই। বলুন পদ্ধতি মতন হ'ল কাজটা ? তাও আমারই কি সময় আছে মশাই ? একলা মানুষ উদয়াস্ত কোথায় চাল, কোথায় ডাল, কোথায় তেল, কোথায় কাপড় এই ধান্ধায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। ওরই মধ্যে আবার বৌ আনবার হিড়িক থাকলে মাথার ঠিক থাকে ; বলুন ? চারটের সময় পৌঁচেছি, ছ'টার সময় তারা মেয়েকে সাজিয়ে গুজিয়ে বের করে দিলে। তাড়াহুড়োর মধ্যে গোলমালে তিনটে কনের কোনটেকে ছাড়লে তারাই বা কি বুঝবে, আমিই বা কি জানব ?"

বৃদ্ধ উগ্রভাবে ফিরিয়া চাহিলেন, বলিলেন—"সেটুকুও জ্ঞান নেই ? অথচ মেয়ের বিয়ে দিলেন ?"

ভদ্রলোক আরও চটিয়া উঠিলেন—"আরে, কোন্ শ্বশুরবাড়ি থেকে কার শ্বশুর এল ভালো করে কি সন্ধান নেবার ফুরসৎ পেলে তারা ? সব শুনেও আপনি বোকা বনছেন !"

বৃদ্ধ মুখটা ঘুরাইয়া লইয়া শুধু হাত দুইটা ভদ্রলোকের দিকে মুক্ত করিয়া বলিলেন—"এমন বিবাহের ব্যাপারে শুধু আপনিই থাকতে পারেন মশাই।"

—হাত দুইটা সরাইয়া লইয়া রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে ভালো করিয়া ওদিকে ঘুরিয়া বসিলেন। ভদ্রলোক আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন—"পারিই তো, আলবাৎ পারি, একশ' বার পারি, সময়টা কি যাচ্ছে দেখতে হবে না ?—আমার কথা হচ্ছে—একটা হোলেই হোল। বাড়িতে একটা বৌ এল, একটা ট্রাঙ্ক এল, ব্যস্।...আরে যা হওয়া উচিত তা হচ্ছে কোথায় ? যা চাই তা পাচ্ছি কোথায় ? ছেলে বৌ আনবে, বাপ ঘাড়ে করে নিয়ে আসছে ; করলাম ঘোড়ার গাড়ি, যাচ্ছি বাসে। বেশ গুছিয়ে মারতে পারলে না ধাক্কা লরিটা, নৈলে

তাই বা কে যেত মশাই ? শ্বশুর-বৌয়ে এতক্ষণ বৈতুরণী সাঁতরাচ্ছি।····তার জায়গায় কোনও একটা ট্রাঙ্ক আর কোনও একটা····”

হঠাৎ কি ভাবিয়া, একবার কুঁজো হইয়া বাহিরে চাহিয়া, একেবারে হৈ-চৈ লাগাইয়া দিলেন—“বানো, বানো, বান্‌কে, লেডিজ্‌ হ্যায় ; কনডাক্টার বানো····মশাই ঘন্টি দিন, এলার্ম ! পেরিয়ে গেল যে আমার নামবার জায়গা····আমায় যে আবার শ্যামনগর যেতে হবে—দেখো, কোন মতেই দাঁড়াবে না !····”

চেঁচামেচির মধ্যেই বাসটা গতিবেগ কমাইয়া দমদম স্টেশনের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। একটা বড় জায়গা ; নামায় ওঠায়, হাঁকডাকে, বচসায় একটা বেশ বড় রকম গোলমালের সৃষ্টি হইল ; সন্ধ্যা হইয়া গেছে বলিয়া জটলাটা আরও জটিল হইয়া উঠিল। ড্রাইভার কনডাক্টারকে জানাইল এখনও পাঁচ মিনিট লেট, তাড়াতাড়ি করিতে নিজেও দ্রুত কয়েকটা হর্ন দিয়া হুড়াহুড়িটা আরও বাড়াইয়া দিল।

নামিতে নামিতেও আমার খানিকটা দেরি হইয়া গেল। যখন নামিলাম তখন বাস স্টার্ট দিয়াছে।

স্টেশনের দিকে কয়েক পা অগ্রসর হইয়াছি, হঠাৎ বাসের মধ্যে থেকে একটা হৈ-চৈ উঠিল। ঘুরিয়া দেখি সেই কালো যুবকটি জানালা দিয়া এতখানি গলা বাড়াইয়া হাত নাড়িয়া নাড়িয়া প্রাণপণে চিৎকার করিতেছে—“ও মশাই····আমার বৌ !—আমার বৌ টেনে নিয়ে যাচ্ছেন ! —ও মশাই !”

ঘুরিয়া দাঁড়াইলাম। দেখি একটা ছোঁড়ার মাথায় ট্রাঙ্ক দিয়া একটি ঘোমটা-টানা মেয়ের হাত ধরিয়া ভদ্রলোক হন হন করিয়া খানিকটা দূরে উল্টা দিকে চলিয়াছেন। বাসে আরও চেঁচামেচি পড়িল, বাসটার গতিও একটু মন্দ হইল, ভদ্রলোকের যেন কানে গেল এতক্ষণে

আওয়াজটা। ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া গোলমালের মধ্যে কথাটা বুঝিবার চেষ্টা করিলেন, তাহার পরে একবার মেয়েটির পানে চাহিয়া একটু থতমত খাইয়া গেলেন যেন।

কিন্তু সে দু'এক সেকেণ্ড মাত্র, তাহার পরই মেয়েটির হাত ধরিয়া একরকম টানিতে টানিতে পূর্ববৎ চলিতে আরম্ভ করিলেন। কনডাক্টার হাঁকিল—"ঠিক হ্যায়!" বাসটা আবার গতিবেগ বাড়াইল, চেঁচামেচিটা আরও বাড়িয়া উঠিল।

এই পর্যন্তই দেখিয়াছিলাম। পুলের উপর আমার ট্রেনটা আসিয়া পড়িতে স্টেশন পানে ছুটিতে হইল। শেষ পর্যন্ত কি হইল তাহাও জানি না, ভদ্রলোক জানার পরও সেই বৌটিকেই টানিতে টানিতে অগ্রসর হইলেন কেন তাহাও বুঝিতে পারি না।

শ্যামনগরে যাওয়াটা এতই দরকারি ছিল, না, ওঁর সেই তর্ক—যা অবস্থা আর সময় পড়িয়াছে, যে-কোন একটা ট্রাঙ্ক আর যে-কোন একটা বৌ বাড়িতে যে-কোন উপায়ে পৌঁছাইয়া দিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত?

আমার প্রথম গল্প

আমার লেখার ইতিহাসের একেবারে গোড়ার অধ্যায় বড়ই করুণ,—এই জন্যে যে আমার প্রথম গল্পটি মারা যায়। খুবই দুঃখের বিষয় নিশ্চয়, কিন্তু সেটি বেঁচে থাকলে ইতিহাসটি আরো করুণ হয়ে উঠত, কেননা আমায় নিজেকে মারা পড়তে হোত। আপনারা একটু থতমত খেয়ে গেছেন দেখছি। তাহলে কথাটা খুলে বলতে হোল—

বলতে গিয়েও দ্বিতীয় বিপদ আপনারা মনে করবেন তেলের বিজ্ঞাপন দিচ্ছি। কিন্তু উপায় নেই। তেলে জলে কখনও মেশে না, কিন্তু তবুও একথা মানতেই হয় যে অন্তত একটি তেল আমাদের সাহিত্যরূপ জলের সঙ্গে নিতান্ত নিগূঢ়ভাবেই মিশে আছে। সেটি কুন্তলীন। একে বাদ দিলে যে শরৎচন্দ্রেরও খানিকটা বাদ দিতে হয় সে সংবাদটা অনেকের বোধ হয় জানা আছে।

ওঁরা তখন প্রত্যেক বছর ছোট গল্পের জন্যে পুরস্কার দিতেন। গল্পগুলি বেশ ঝকঝকে তক্‌তকে একখানি বইয়ের আকারে বেরুতো, দাম থাকত কিনা আমার ঠিক মনে পড়ছে না, তবে বইখানার বেশ প্রচার ছিল। ঐ বইখানিতে একটু জায়গা পাবার লোভ প্রবল হয়ে উঠলো। লোভের মূলগত ব্যাপারটা কি, অর্থাৎ টাকার দিকে বেশি ঝোঁক ছিল কি যশের দিকে, তা এখন ঠিক মনে পড়ছে না। অনেক দিনের কথা তো? তখন বোধ হয় থার্ড ক্লাশে পড়ি। তবে বেশি সম্ভব যশ। ঐ একটা সময়, যখন অপযশের ভয় থাকে না বলে যশের ছবিটা খুব স্পষ্ট হয়েই চোখের সামনে ফুটে ওঠে। এখন এক কলম

লিখতে হলে সমঝে বুঝে এগুতে হয় ; পাঠক আছেন, পাঠিকা আছেন ; পাঠক যা চান, পাঠিকা তাতে নাক সিঁটকোন, আবার এক বয়সের পাঠক পাঠিকা যা পেলে দু হাত তুলে আশীর্বাদ করেন, অন্য বয়সের পাঠক পাঠিকার সামনে সেইটেই এগিয়ে দিলে হাত পা ছুঁড়ে অভিসম্পাত দেন ! আবার সবার ওপরে আছেন সমালোচক।

অবশ্য এক শ্রেণীর সমালোচকের ভাবনা তখনও যে না ছিল এমন নয়, অর্থাৎ যারা বাছাই করবে। তবে তাদের কাল্পনিক মূর্তি ছিল অন্য ধরণের। হয় গল্পটা নেবে, না হয় ফেরত দেবে, চুকে গেল তাদের সঙ্গে সম্বন্ধ। যতটা মনে পড়ছে এখন—সেই কাল্পনিক মূর্তিকে এখনকার সমালোচকের পাশে দাঁড় করিয়ে যতটা বুঝতে পারছি, তাতে তাদের তেমন ভয়ংকর কিছু বলে মনে হোত না নিশ্চয়। তারপর যদি একবার হাত গলে বেরিয়ে যেতে পারলাম তো আর পায় কে ! এই ছিল মনের ভাবটা।

যাই হোক্ টাকার লোভেই হোক্ বা যশের লোভেই হোক্, অথবা সাহিত্যিক প্রেরণা বলে যে গালভরা কথাটা আজকাল শুনি, তাই হোক্ কোমর বেঁধে লেগে গেলাম। ব্যাপারটি খুব গোপনীয়, প্রথমত, গল্পলেখা ইস্কুলের পড়া করা নয়, দ্বিতীয়ত, গল্পের মধ্যে নায়িকা বলে একটি মেয়েকে আমদানি করতে হয়, যিনি আমার নয়নের মণি হলেও বাবা কাকা প্রভৃতির যে চক্ষুশূল হবেন এ জ্ঞানটা টন্‌টনেই ছিল। অবশ্য নায়িকা, অর্থাৎ যাকে ভালবাসা চলে এই রকম বয়স আর শ্রীছাঁদের মেয়ে না হলেও যে গল্প হয় সেটা তখনও কিছু কিছু জানতুম, আর এখন ভালো রকমই জানি—এখন বোধ হয় আমার লেখায় বেশিরভাগ এড়িয়েই চলি ; কিন্তু তখন বয়স যে অন্যরকম। এঁরই অ্যাপীল ছিল সব চেয়ে বেশি।

এত বেশি ছিল যে এই ধরণের মেয়ে খাড়া করে নিজেই নায়ক হয়ে দাঁড়ালাম, তারপর চলল ভাঙাগড়া, অর্থাৎ প্লটের মারপ্যাঁচ! ব্যাপারটা সবিস্তারে আপনাদের কাছে বর্ণনা করতে পারব না এখন, ক্ষমা করবেন। না পারবার কারণ, অনেক দিনের কথা, তার ওপর নিজেকে নায়ক করতে আমার মানসী নায়িকার সঙ্গে এমন আকণ্ঠ প্রেমে পড়ে গেলাম যে একটা ছোট গল্পের সাইজ হিসাবে ব্যাপারটা অতিরিক্ত জটিল হয়ে উঠ্‌লো। খাতাটি বেশ মনে আছে। এক্সারসাইজ বুক নয়। সেটা ত চুরিরই ব্যাপার। আন্দাজ তিন ইঞ্চি বাই সাত ইঞ্চি একটা লম্বাটে বাঁধানো নোট বুক, আকার-প্রসারে অনেকটা অটোগ্রাফ খাতার মতো। হাসি, অশ্রু, মান-অভিমানে সেটা একেবারে উপচে পড়্‌লো। আবার, একবার যা লিখেছি তাতে সন্তুষ্ট হতে পারিনি, কেটেছি, নতুন করে লিখেছি, দু'এক জায়গায় বোধ হয় আবার কেটে নতুন করে লিখেছি; নিজেই নায়ক, আবার নিজের হাতেই কলম, বুঝতেই পারেন পূর্ণ স্বরাজ একেবারে—সে যা প্যাঁচাল জিনিষ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল তাকে এতদিন পর্যন্ত স্মৃতির মধ্যে ধরে রাখতে পারে এ রকম উগ্র স্মার্ত এ পর্যন্ত তো চোখে পড়্‌লো না।

হাসিও পায়, চমৎকার সময় এই সেকেণ্ড থার্ড ক্লাশে পড়বার বয়সটা। গল্প যে শেষ করব একটা কিছু ঘটে নায়ক নায়িকা ক্ষান্ত হবে তবে তো? ধরুন যেমন—বিচ্ছেদ হয়ে গেল, আর আশা নেই; বিবাহ হয়ে গেল, আর দরকার নেই; কিংবা দুজনের মধ্যে একজন অথবা দুজনেই আত্মহত্যা করলে—আর বালাই-ই নেই; এক্ষেত্রে লেখক নিজে নায়ক হওয়ায় দাঁড়ালো এই রকম যে কয়েকবার বিচ্ছেদের পরেও আশা আর গেল না; বিবাহের পরও রস জমাবার জন্যেই কিছু বাকি রয়ে গেল, আর নায়ক নায়িকা পেলে অখণ্ড পরমায়ু; ঠিক মনে

পড়েছে না, হয় বিষ খেতেই চাইলে না, না হয় খেয়েও শিবের মতন নীলকণ্ঠ হয়ে বেঁচে রইল !

ফল এই হলো—যদি অন্য কাউকেও নায়ক করতাম তো গল্পটা তাড়াতাড়ি শেষ হোত, এ নায়িকাকে একবার ছেড়ে আবার তখুনি ফিরিয়ে এনে, তাও বার বার এইরকম করে, গল্পটা যখন শেষ হলো তখন তাকে ডাকে পাঠানোর শেষ দিন একেবারে শিয়রে এসে গেছে। এইবার একটু চাঁচাছোলা করতে হবে। তারপর কপি করা। সমস্তটাই তো অভিভাবকদের দৃষ্টি এড়িয়ে করতে হবে। তার ওপর ছোট ভাইদের অপদৃষ্টি আছে, তারা যেন আঁচ পেয়েছে, আমি ভেতরে ভেতরে কি একটা করছি—বেয়াড়ারকম কৌতূহলী হয়ে উঠেছে সবাই ; রীতিমত নার্ভাস হয়ে উঠলাম। এদিকে পড়াতেও ক্ষতি হতে লাগলো, স্কুলে বেঞ্চে দাঁড়ানোটা, নিদেন পক্ষে মাস্টারের ধমক টিটকিরি খাওয়াটা একটা রোজকার ব্যাপার হয়ে পড়লো। ততদিন শুধু ঐ কথাই ভেবে ভেবে আর লিখে লিখে নিজেকে এমন পাকাপোক্তভাবে একজন নায়ক করে তুলেছি, যে এইসব ব্যাপার নিয়ে বড্ড বেশি অপমান বোধ করতে লাগলাম, চৌদ্দ পনেরো বছরের একটি মেয়ে যার ভালবাসায় মুগ্ধ, যাকে পাবার জন্যে প্রাণপাত করতে বসেছে, সে ইংরেজ কবে কার্নাটিক দখল করেছিল, কিংবা একটা বিশেষ জায়গায় shall বসবে কি will বসবে বলতে না পারার জন্যে ক্লাশের বেঞ্চে দাঁড়িয়ে সবার হাস্যাস্পদ হচ্ছে এ কি ভাবতে পারা যায় ?

যাই হোক, এই সব বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যে আর এক চোট নিয়ে পড়লাম গল্পটাকে। একটা উৎসাহও লেগে রইল—তরী প্রায় ডাঙায় ভিড়িয়েছি তো। কিন্তু মাজাঘসা করতে গিয়ে সম্পূর্ণ এক নতুন ধরণের বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়তে হোল। জানা ছিল ভালবাসার

দেবতা অন্ধ, এখন দেখলাম, তাঁর হাতে নিজেকে সমর্পণ ক'রে এমন সব কাণ্ড করে বসে আছি যে সত্যিই যে চোখ চেয়ে দেখে তার সে



একজন পাকা নায়ক

রকম করবার কথা নয়। অন্ধভাবে শুধু উচ্ছ্বাস আর হা-হুতাশের মধ্যে দিয়ে কলম চালিয়ে গেছি, সে যে কোথায় চলেছে একেবারেই হুঁস করিনি, ফলে এই দাঁড়িয়েছে যে শাদা বাংলায় যাকে গল্প বলে তা তো হয়ইনি, অধিকন্তু পাতায় পাতায় অসঙ্গতি,—আর এখন যে জিনিষটাকে গল্পের situation বা ঘটনাসংস্থান বলে বুঝি তার মধ্যে এতো আশ্চর্যভাবে অসম্ভব কাণ্ড সব ঢুকিয়েছি যে নিজেকেই শিউরে শিউরে উঠতে হলো। লেখার ঝোঁকে, অনুভূতির তীব্রতায় হ্রস্ব দীর্ঘ জ্ঞানশূন্য হয়ে যা করেছি, এখন তাকে নিষ্ঠুরভাবে ছেঁটে কেটে ফেলতে হল !···· আপনাদের মধ্যে যাঁরা লেখক তাঁদের নিশ্চয় জানা আছে লেখার চেয়ে লেখা বাদ দেওয়াটা কত শক্ত। প্রথমত মায়া বলে একটা জিনিষ আছে। কারুর কারুর ছটা আঙুল হয়, দেখে থাকবেন, একটা অসঙ্গতি তো ? কিন্তু ছেঁটে ফেলতে পারে কি ? পারে না যে তার কারণ শুধু অপারেশনের ভয় নয়, একটা মায়াও হয়, আহা শরীর থেকে বেরিয়ে এক প্রান্তে একটু আশ্রয় নিয়েছে, শরীরের রক্ত মাংস দিয়ে পুষ্ট করেছি, থাকই না। একটা ফালতু আঙুল বৈ তো কিছু না ! মনের থেকেও যা একটা ঝোঁকে বেরিয়েছে, দরদ দিয়ে যাকে এক সময়ে পুষ্ট করেছি তার সম্বন্ধেও এইরকমই একটা মায়া আসে। মনে হয় যে নিড়ানি দিয়ে গাছটা পুঁতেছিলাম তাই যেন এখন তার গোড়ায় বসাচ্ছি। এ একটা দিক ; তা ভিন্ন লেখা কাটলে যে দাগটা হয় সে দাগে নতুন লেখা মিলিয়ে বসানোও বড় দুষ্কর হয়ে ওঠে। আর একবার গাছের তুলনা দিয়ে বলি, খুব পাকা মালী না হলে এই grafting অর্থাৎ কলম বাঁধায় সুবিধা করতে পারে না।

গল্পের কথায় ফিরে আসা যাক। তালগোল যা পাকিয়ে গিয়েছিল, তাকে কেটে ছেঁটে সোজা করে আনা তো দুষ্কর হয়ে উঠলোই, যদি

বা ক'দিন গলদঘর্ম হয়ে একটা কিছু দাঁড় করান গেল তো—তাকে সেই অজস্র কাটাকুটির "হেঁটোয় কাঁটা ওপরে কাঁটা"-থেকে উদ্ধার করা এক-রকম অসম্ভবই হয়ে উঠলো!

এদিকে গল্প পাঠাবার শেষ দিন ঘাড়ে এসে পড়লো। এখন সেই থার্ড ক্লাশের সাহিত্যলিপ্সু ছেলেটিকে অনেক পোড় খাওয়া সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখে এই সব কথা বলছি, তখন তো তা ছিল না। শত বাধা, সব নৈরাশ্য কাটিয়ে মনে হচ্ছে এইবার সাহিত্যিকের মুকুট উঠলো মাথায়। আর কটা দিনই বা? একদিন সবাই দেখবে অমুক স্কুলের অমুক ক্লাশের অমুক নামের ছাত্র গল্প লেখা নিয়ে পুরস্কার পেয়েছে। একেবারে পুরস্কার! শুধু যে বইয়ে একটা গল্প বেরুল তাই-ই নয়, সে তো রামা, শ্যামা, অনেকেরই বেরুচ্ছে। আশ্চর্যে সবাই হাঁ করে থাকবে!

সুখের বিষয় কাউকে হাঁ করতে হয়নি, দিন কতক পরে যখন নির্বাচিত গল্পের বই বেরুল, অমুক স্কুলের অমুক নামের ছেলেকেই উল্টে হাঁ করে থাকতে হোল—তার গল্পের নাম গন্ধও নেই কোথাও!

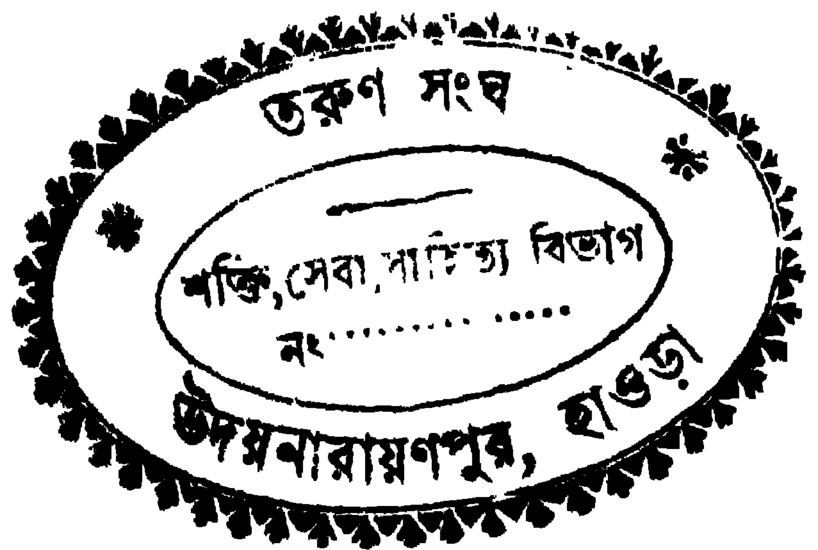
সুখের বিষয় কেন বললাম? গল্পটা বেরুলে যাঁরা প্রশংসার দৃষ্টি নিয়ে হাঁ করে থাকতো তাদের পাশে একেবারে অন্যরকম দৃষ্টি নিয়ে যে বাবা কাকাও এসে দাঁড়াতেন এটা একেবারে খেয়ালই হয়নি। বলা বাহুল্য নায়কের পাঠ করতে গিয়ে ক্লাশের পরীক্ষাটা বেজুত হয়ে গেল, ওঁরা দুজনে যেন সন্দিগ্ধই হয়ে পড়েছিলেন যে আমি ক'দিন ধরে ভেতরে ভেতরে একটা কিছু মতলব নিয়ে রয়েছি। আমার হাড় ক'খানার সৌভাগ্য যে সে মতলব যে কত গভীর, আমি যে কী তলে তলে জল খাচ্ছিলাম, সেটা আর জানবার সুযোগ হোল না ওঁদের।

আপনারা কি দুঃখিত হলেন যে আমার প্রথম গল্পটির কোন নিশানাই রইল না পৃথিবীতে? কিন্তু গল্পটি প্রকাশিত হলে আমারই যে কোন নিশানা রাখতেন না বাবা আর কাকা মিলে, সেইটিই কি সুখের কথা হোত?

* * * *

এটি আমার গল্পের গল্প, সুতরাং উপসংহার হিসাবে শেষে দুটো কথা বললে মন্দ হয় না।

গল্পটা পাঠাতে নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে একটা দিন দেরি হয়ে গিয়েছিল। না-বেরুনটা অবশ্য শেষ পর্যন্ত ভালো হয়েছে সব খতিয়ে দেখতে গেলে, কিন্তু তবু তা একটা নৈরাশ্যই? তার পাশে পাশে ভগবান্ বরাবরের জন্যে একটু সান্ত্বনা দিয়ে রেখেছেন। সেটা এই যে ঐ দেরি হওয়ার জন্যেই কর্তারা গল্পটা আর খুলে দেখেননি নিশ্চয়। অর্থাৎ হলেও হতে পারতাম মস্ত বড় একটা কিছু এই বিশ্বাসটুকু রয়েই গেল! আর একটা কথা, কাল্পনিক হোক আর যাই হোক—সেই যে উঠতি বয়সে একবার কষে ভালবেসে নিয়েছিলাম—আর জীবনে ওদিকে তাকাবার দরকারই হয়নি। *



* কলিকাতা-কেন্দ্র অল-ইণ্ডিয়া-রেডিওর সৌজন্যে

"শ্রীমান্ রমেন রায়, বি-কম্"

আবার সেই বকুলতলাটিতে তুই জনের দেখা হইল। সুপ্রিয়া প্রশ্ন করিল—"হঠাৎ দেখা করতে বলেছ যে—তাও আবার চিঠি লিখে?"

রমেন বলিল—"হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল।"

চমৎকার জ্যোৎস্না, এখানে ওখানে তু'একটা বকুল ফুল নিঃসাড়ে ঝরিয়া পড়িতেছে—যেন সেই জ্যোৎস্না ছানিয়াই। সুপ্রিয়া একটু নিঃশব্দে মাথা নিচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর একবার মুখটা তুলিয়া বলিল—"আর এখন হঠাৎ কিছু মনে পড়লে তা মনেই চেপে রাখতে হবে, নয় কি?"

উত্তর চাহিয়া প্রশ্ন নয়, তবু একবার মুখের পানে যেন উত্তরের জন্যেই চাহিয়া, তখনই ঘুরিয়া পা বাড়াইল।

২

আর একটু গোড়া থেকে না বলিলে কথাটা পরিষ্কার হইবে না, তবে সংক্ষেপেই বলিব।

রমেনের বয়স যখন পনর-ষোল বৎসর, ম্যাট্রিক ক্লাশে পড়ে, সেই সময় সুপ্রিয়ার পিতা এই শহরে বদলি হইয়া আসেন। এই বাসার পূর্বের বাসিন্দার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা থাকায় কয়েক দিনের মধ্যেই তুইটি পরিবারের হৃদ্যতা জমিয়া উঠিল। সুপ্রিয়া তখন মাইনর স্কুলের ছাত্রী, তুই দিকে বেণী দোলাইয়া স্কুলে যায়। সতের-আঠার বৎসর পর্যন্ত তুই

দিকে বেণী দোলাইবার রেওয়াজটা এখন হইয়াছে, তখন দশ বৎসর না যাইতে যাইতেই দুইটা বেণীকে একটিতে মিলাইয়া লইত।

পরিচয়ের প্রায় মাসখানেক পরের কথা, এক দিন কি একটা পড়া জিজ্ঞাসা করিতে আসিলে সুপ্রিয়ার জননী বলিলেন—"তুই তোর রমেনদার কাছে জিজ্ঞেস করে নিলেই পারিস। আমার বিদ্যে আর কতদূর? তা ভিন্ন ভুলেও যাচ্ছি ক্রমে ক্রমে সব।···বরং তাই যা।"

সুপ্রিয়ার পিতা পাশের ঘরেই ছিলেন, কথাটা কানে গেল। সুপ্রিয়া চলিয়া গেলে আসিয়া প্রশ্ন করিলেন—"তুমি নিজেই পড়াবে বললে—একটু অন্যমনস্ক থাকবে—তাই মাস্টার রাখলাম না; তাহলে একজন দেখব?"

"কি দরকার?"

"তবে যে ও-বাড়ির রমেনের কাছে পাঠালে?"

স্ত্রী চক্ষু নত করিয়া একটু চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর চক্ষু তুলিয়া একটু লজ্জিত ভাবে হাসিয়া বলিলেন—"না হয় গেলই এক-আধ বার?"

তাহার পরেই আরও স্পষ্ট করিয়া দিলেন—"না, আমার ছেলেটিকে বড় পছন্দ হয়েছে, ভেতরে ভেতরে খবরও নিয়েছি। কোন বাধা নেই····"

স্বামীও একটু চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন—"ওর পাস দেবার বছর এটা····বইয়ের দিকেই মন থাকা ভালো।"

"তুমি যে এদিকে বলো তোমার স্কলারশিপ পাওয়ার জন্যে দায়ী কতকটা আমিই?"

নিজেদের জীবনে ঠিক এই ধরণেরই একটা রোমান্স আছে, সেটাকে অস্বীকার করা গেল না। "যেমন বোঝ"—বলিয়া ঈষৎ হাসিয়া স্বামী চলিয়া গেলেন।

এদের রোমান্স অবশ্য অনেক পরে আরম্ভ হইল। তাও দু'পক্ষের তাহাতে কতটা অংশ অন্তত সুপ্রিয়ার তাহাতে সন্দেহ আছে। মায়ের ধাত অনুযায়ী সুপ্রিয়া গোড়া থেকেই একটু ভাবপ্রবণ, আর এই প্রবণতাটুকু ধীরে ধীরে বাড়িয়াই চলিল। তবে রমেনকে ঠিক বোঝা যায় না, ও যেন কাজটাকেই জীবনে বেশি করিয়া লইয়াছে। বেশ টক টক করিয়া একে একে পাস দিয়া গেল, প্রত্যেক বারেই বেশ কৃতিত্বের সঙ্গে। এই পাস দেওয়ার পাশেই যে জীবনে আর একটা ব্যাপার হইতেছে, আর একটি জীবন যে এই জীবনে ধীরে ধীরে মিশিয়া আসিতেছে—কখনও উচ্ছ্বসিত লহরীতে, কখনও বা নীরব স্রোতমাত্রেই, সেদিকে তাহার যেন লক্ষ্যই নাই। সুপ্রিয়া কিছু বুঝিতে পারে না, এক এক সময় আসে ক্লান্তি, এই কর্মপ্রবণ উদাসীনের সামনে আর কত করিয়া নিজেকে স্পষ্ট করিয়া ধরিবে?....কিছু যে না পায় এমন নয়, সেইটুকুকেই পাথেয় করিয়া সে আগাইয়া চলে। আর না আগাইয়া উপায়ও ত নাই—ভালবাসার ধর্মই যে এই,—ওদিকে থাকিবে ঔদাসীন্য, এদিকে থাকিবে নিরাশার ক্লান্তি, তাহার পর এই ক্লান্তিই জোগাইবে চলার শক্তি। এমন অনিয়মের রাজ্য ত আর নাই!

আর যেমন এইমাত্র বলিয়াছি—নিতান্তই যে পায় নাই এমনও ত নয়, তা সে যত অল্পই হোক। সেই অল্পই আবার একটা সান্ত্বনার সংশয় জোগাইয়াছে মনে—হয়ত পুরুষকে এর বেশি করিয়া পাওয়া যায় না, হয়ত অন্তরে আছে অসীম ভালবাসা, শুধু যেটুকু পাইল তাহার বেশি প্রকাশ করিবারই ক্ষমতা নাই পুরুষের।....এই বকুলতলাতেই কতদিনের কথা মনে পড়ে। যেবারে আই-এ পরীক্ষা দিল রমেন সেবারকার কথা: গ্রীষ্মের ছুটিতে আসিল না, পড়ার ক্ষতি হইবে।

পূজার ছুটিও অনেকদিন কাটাইয়া আসিল। সুপ্রিয়া অভিমান করিয়াই দেখা করিতে গেল না।—একটা দিন বুঝি সত্যই যায় কাটিয়া এমন সময় প্রায় সন্ধ্যার কাছাকাছি রমেন নিজে আসিয়া উপস্থিত।

সুপ্রিয়ার জননীকে প্রণাম করিয়া রকে বসিয়া গল্প করিতেছে—এখনও ছবিটি যেন লাগিয়া আছে সুপ্রিয়ার চোখে—গল্প করিতেছে, কিন্তু সে শুধু ঠোঁট দুইটির সাহায্যে—মন একেবারে অন্য কোথায়—দৃষ্টি চঞ্চল, চোখ দুইটি যেন কিসের সন্ধানে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে—প্রশ্নে-উত্তরে যেমন গোলমাল, বেশ টের পাওয়া যায় কান দুইটিও অন্যত্র—ঘরের মধ্য হইতে জানালার ফাঁকে সুপ্রিয়া দেখিতেছে—সে কি এতই বোকা, এত মোটা লক্ষণগুলাও বোঝে না?

এক সময়, যেন হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল এই ভাবে, অথচ নিতান্ত একটা শাদা প্রশ্ন করার মত করিয়া রমেন প্রশ্ন করিল,—"ইয়ে—সুপাকে দেখছি না যে?"

মা একটু মুখ ফিরাইলেন, অল্প একটু হাসিলেন কি?—বলিলেন, "মাথা ধরেছে বলে সে একটু আগে বিছানায় গিয়ে শুলো।"

আবার একটু গল্প চলিল, যেন সুপ্রিয়ার আলোচনা একেবারে বেশিক্ষণ করিলে ভিতরের কিছু একটা প্রকাশ হইয়া পড়িবার ভয় আছে। জানালার ছিদ্রপথে সুপ্রিয়া আরও উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে—সংবাদটুকুর পরিণাম কি হয় জানিতে হইবে তো?....মায়ের সঙ্গে রমেনের গল্প আরও এলোমেলো হইয়া উঠিয়াছে।....মা এত ধরিতে পারেন এই সব ব্যাপার! মাঝে মাঝে তাঁহার মুখে একটু যে হাসির ভাব জাগিয়া উঠিতেছে তাহার সঙ্গে-মূল গল্পের কোন সংস্রব আছে নাকি?...সুপ্রিয়ার তো মনে হয় না।

তাহার পর রমেনের দ্বিতীয় বার হঠাৎ মনে পড়ার পালা আসিল ; বলিল—"তা মাথাব্যথা করেছে বলে সুপা বিছানায় শুতে গেল কেন—এই অবেলায় ?"

মা বলিলেন—"তাই তো গেল।"

"না, শোওয়াটা ঠিক নয় তো। এই তো আমারও মাথাটা ধরেছিল—বেশ করেই ধরেছিল। ভাবলাম রাত জেগে এসেছি, তাই বুঝি। সমস্ত দুপুরটা বিছানায় পড়ে ঘুমোলাম। নাঃ, বয়ে গেছে মাথা ছাড়তে। 'দুত্তোর' বলে তেড়েফুঁড়ে উঠে বেশ এক চক্কর দিয়ে এলাম : আর যেন সে মাথাই নয় ?"

—অল্প হাসিয়া হাতটা একটু ঘুরাইয়া দিল।

মা বলিলেন—"আমি তো বারণই করলাম শুতে এই অবেলায় ; দেখো না বলে, যদি শোনে।

রমেন যেন কোন ঘরটা সুপ্রিয়ার তাহা জানে না এই ভাবে একেবারে উল্টা দিকে চাহিয়া ডাকিল—"সুপা !···কোথায় সে ?"

যে মা এত বেশি বোঝেন তাঁহার সামনে রমেন বোকার মতো লুকোচুরি করিতে যাক্, সুপ্রিয়া পারিল না ; মুখ চোখ যে রাঙা হইয়া উঠিয়াছে তাহার জন্য অল্প একটু সময় লইল, তাহার পর উঠিয়া গট গট করিয়া বাহিরে আসিয়া চৌকাঠ ধরিয়া দাঁড়াইল ; যতটা পারিল সহজ কণ্ঠেই বলিল—"মাথা ধরতে যাবে কেন ? মাও অমনি বিশ্বাস করে বসলেন।"

দুজনেই বিস্মিত ভাবে চাহিয়া রহিলেন, মা প্রশ্ন করিলেন—"তবে ?"

"ঠিক করেছিলাম আমি আগে যাব না দেখা করতে।"

কয়েকটা মুহূর্ত যেন কি রকম গেল। তাহার পরই মা প্রশ্ন করিলেন—"বাঃ, এত দিন পরে এল রমেন, তোর উচিত নয় গিয়ে প্রণাম করা ?"



দু'জনেই বিস্মিতভাবে চাহিয়া রহিলেন

এইবার একটু হাসি ফুটিল সুপ্রিয়ার মুখে, বলিল—"সেই কোটই তো ধরে আমিও বসেছিলাম—ওঁর উচিত নয় আগে এসে তোমায় প্রণাম করা ?"

একটি হাসির মধ্যে মানের পালা বেশ শেষ হইল। এর পর এক সময় দুইটা রগ একটু টিপিয়া ধরিয়া বলা বেশ সহজ হইল—সত্যই একটু মাথা ধরিয়াছে; চা জলখাবারের পর যথাসময়ে মুক্ত হাওয়ার দোহাই দিয়া বকুল তলাটিতে গিয়া বসিতেও তেমন আর সংকোচ বোধ হইল না।

৩

সেটাও ছিল জ্যোৎস্না পক্ষ। সামনের পুকুরটাকে একটা দীঘিই বলিতে হয়। ছোট শহরের প্রায় সবটা ওপারেই, এপারে শুধু রমেনদের বাড়িটি আর শুধু এই গুটিতিনেক কোয়াটার্স। তাহার মধ্যে একটিতে থাকে একটি ক্রিশ্চান পরিবার। এদিকে ঘাট নাই, জল থেকে একটু দূরে একটা শানের চবুতরা আছে; একটু এদিক ওদিক ঘুরিয়া উহারা দুই জনে তাহার উপর গিয়া বসিল। ধীরে ধীরে চাঁদ স্পষ্ট হইয়া আসিল, সামনের দূরের ছোট ছোট ঢেউগুলির উপর রূপালি রেখা ফুটিল। বেশি কথা হইল না, রমেন নিজের কলেজের কথা বলিল দু'একটা, সুপ্রিয়ার স্কুল সম্বন্ধে দু'একটা প্রশ্ন করিল, এক সময় বলিল সে ঠিক করিয়াছে বি-এ না পড়িয়া বি-কম পড়িবে—আজ কাল ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকেই নজর দেওয়া ভালো; তাহার পর একবার প্রশ্ন করিল—"জ্যোৎস্না নিশ্চয়ই তোমার খুব ভাল লাগে?"

সুপ্রিয়া উত্তর করিল—"ভালই তো লাগে। কেন বল তো?"

কি একটা আশা করিয়া মুখ নিচু করিয়া রহিল।

রমেন নির্লিপ্ত ভাবে পা দুলাইয়া বলিল—"শতকরা ৯৩-৫ ভাগ মেয়ের জ্যোৎস্নাই ভাল লাগে—স্ট্যাটিস্টিক্স।" তাহার পর যতক্ষণ না উঠিল, দুজনে জ্যোৎস্নার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

পর দিন আবার দুজনে আসিয়া এক সময় বকুলতলাটিতে বসিল। আরও পরিষ্কার জ্যোৎস্না, হাওয়াটা একটু জোর। সাধারণ ভাবে সৌন্দর্য লইয়াই আলোচনাটা উঠিল প্রথমে, সেটা একটু ব্যক্তিগতও হইয়া উঠিল ক্রমে, সুপ্রিয়ার কয়েক বার যেন মনে হইল রমেন চারিদিককার এই সৌন্দর্যের সঙ্গে মিলাইয়া মিলাইয়াই তাহাকে মন্থর দৃষ্টিতে দেখিয়া লইল। তাহার পর যখন সুপ্রিয়ার মনটা আরও উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে, একটা কিছু আশা করিতেছে, রমেন হঠাৎ বি-কমের চর্চা আরম্ভ করিল। এবং তাহার পর সেদিন সেই কথাই চলিল—অর্থনীতি ব্যাপারটা মোটামুটি কি—একটা কাপড়ের কল করিতে ন্যূনকল্পে কত খরচ হইতে পারে, ন্যূনপক্ষে কত মূলধন লইয়া আরম্ভ করিলে চলে···ইনসিওরেন্স অর্থাৎ জীবন-বীমা জিনিষটা স্থূলত কি—দেশে এখন জীবন-বীমা কোম্পানির বেশি দরকার কি কাপড়ের কলের। মনের কয়েকটা গোপনীয় কথাও বলিল—এক একবার মনে হয় ঢাকেশ্বরীর মত একটা কলের মালিক হইতে পারিত ত বেশ হইত, আবার মনে হয় অল্প মূলধনে ত সে হইবার উপায় নাই, তাহার চেয়ে ছোট করিয়া একটা বীমা কোম্পানি সুরু করাই ভাল, ব্যবসা-বুদ্ধি থাকিলে 'হিন্দুস্থান'-এর মত একটা ব্যাপার শেষ পর্যন্ত দাঁড় করান যায়···

উঠিবার সময় বলিল—"আবার কখনও কখনও মনে হয় বি-কম্‌টা নিয়ে এসে এই দীঘিটা ঠিকে নিয়ে মাছ ছেড়ে চালানি ব্যবসা লাগাই, কতকটা কো-অপারেটিভ মেথডে; তার পর আরও একটা বড় দীঘি, ক্রমে আরও····তুমি কি বল?"

সুপ্রিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া উঠিতে উঠিতে জ্যোৎস্নাপ্লুত সরসীর দিকে একবার চাহিয়া লইয়া বলিল—"মন্দ কি? মাছের ব্যবসার চেয়ে আর বড় কি আছে?"

রাত্রিবেলা শুধু ভাবিয়া কাটাইল—পুরুষ কি? রমেন কি? তাহার জীবনের সত্য কি শুধু স্ট্যাটিস্টিক্স্, কাপড়ের কল, বীমা কোম্পানি আর দীঘির মাছ? না, সেই মদির স্বপ্নও আছে—বকুলতলার কয়েকটি অলস দৃষ্টিতে যাহার আভাস ছিল—মায়ের সঙ্গে গল্প করার সময় যাহা তাহাকে মাঝে মাঝে আনমনা করিয়া তুলিয়াছিল?

উত্তর পায় না নিজের কাছে। তবে ব্যাকুল আবেগে এই ইঙ্গিতগুলিকেই বুকের সমস্ত উত্তাপ দিয়া জড়াইয়া ধরে।

বকুলতলার দুইটা দিনের এই ইতিহাস, আরও যাহা তাহা এই ধরণেরই কম-বেশি করিয়া।

৪

তাহার পর আসিল জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়।

পাস দিয়া, শিরায় শিরায় বি-কমের নেশার উন্মাদনা লইয়া রমেন বাহির হইয়া গেল। কত কি যে করে, কত যায়গায় যে যায়, কত বাজারেরই যে অভিজ্ঞতা জড়ো করে! দু'মাসে, চারমাসে দু-চার দিনের জন্য যখন আসে বাড়ি, নিজের মনের উন্মাদনা সুপ্রিয়ার মনেও ঢালিয়া দিবার চেষ্টা করে। আবার যেন ঘূর্ণির পাকেই কোথায় মিলাইয়া যায়।

এই সময় একদিন সুপ্রিয়ার একটি ভাল সম্বন্ধ আসিল। পাত্র কাছেই এক জায়গায় জমিদার, বেশ ভাল জমিদারি, বছরে লাখের কাছাকাছি আয়। পাত্র এদিকে শিক্ষিত, সুপুরুষ আরও সব দিক দিয়াই ভাল। বয়সটা একটু বেশি, বত্রিশ, তেত্রিশ। তা এদিকে সুপ্রিয়ারও ত প্রায় একুশ হইতে চলিল।

বাপ মায়ের মধ্যে কাহার মন প্রথমে ঝুঁকিল বলা শক্ত, হয়ত দু'জনেরই একসঙ্গে। সংসার সংসারই তো?—কবেকার রোমান্সের

গোটাকতক দাগ স্রোতের মুখে ধুইয়া গিয়া কতটুকুই-বা আর বাকি থাকে? তবুও একটু দো-মনা ভাব রহিলই জাগিয়া।

সুপ্রিয়াকে জিজ্ঞাসা করা হইল। ওর তখন দারুণ অভিমান; বলিল—তোমরা যা করবে তাই তো ভালো।"

সুপ্রিয়ার জননী গোপনে একবার রমেনকেও পত্র দিলেন,—তুমি বিবাহ করিবে কিনা এ প্রশ্ন নয়, পাত্রটি এই রকম, এত বাঞ্ছনীয়, তোমার কি মত?"

উত্তর আসিল উচ্ছ্বসিত, "খুবই desirable party, যেন কোনমতে হাত-ছাড়া না হয়।"

রমেনের খাওয়া-পরার ভাষাও আজকাল ব্যবসায়িক শব্দ-সম্ভারে সমৃদ্ধ। চিঠিটা যখন এতই অনুকূল, স্বামীকে দেখাইতে আর বাধা রহিল না। একদিন ঘটা করিয়া বিবাহ হইয়া গেল।

এটা মাস-আষ্টেক পূর্বের কথা। বেশ আছে সুপ্রিয়া, কেনই বা থাকিবে না? দু-তিনবার রমেনের সঙ্গে দেখাও হইয়াছে। তাহার পর বকুলতলায় এই প্রথম সাক্ষাৎ; রমেনের আহ্বানে।

কেন যে আসিল সুপ্রিয়া বলা কঠিন। কৌতূহল, না, এক একবার যে অনেক নিচের ক্লাশের পুরানো পড়ার উপর চোখ বুলাইয়া যাইতে ইচ্ছা করে তাহাই?

*　　*　　*

ঘুরিয়া বাসার দিকে পা বাড়াইতেই রমেন একটু আবেগময় কণ্ঠেই বলিল—"যেও না সুপা, তোমায় বেশিক্ষণ দাঁড় করাব না।"

অনেক দিনের ভুলিয়া যাওয়া পুরানো পড়া কি এতই মিষ্ট! সুপ্রিয়ার পা দুইটিই যেন অবাধ্য হইয়া উঠিয়াছে, ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া সে বলিল—"মাকে লেখা তোমার চিঠি আমি দেখেছি, তার পরে কি বলবার আছে আর তোমার?"

অভিমানের ব্যঙ্গ ধরিতে পারে, এ সূক্ষ্মতা রমেনের কোন কালেই বোধ হয় ছিল না ; বেশ নির্বিকার ভাবেই বলিল—"কেন, ট্রানজাক্‌শনটা খারাপ হয়েছে ? তুমি সুখী নও ?"

"কেন হব না সুখী ?"

কয়েক সেকেণ্ডের মৌনতা, তারপর রমেন বলিল—একটা কথা তোমায় আজ বলব, আশা করি রাখবে, জীবনের একটা শেষ অনুরোধ...."

সুপ্রিয়া নীরবে মাথা নিচু করিয়া রহিল। কি মনে হইতেছে তাহার ! সবই যেন ভুলাইয়া দেয় এ কি মাদকতা এই গোটাকতক কথায় ?

রমেন বলিয়া চলিল—"এই আমাদের শেষ দেখা, অন্তত এভাবে। নিতান্ত দরকারী আমার জীবনের পক্ষে কথাটা—তাই তোমায় ডাকলাম। আর সে দরকার তোমার দ্বারাই পূরণ হতে পারে, কেন না আমার জীবনের যা আশা আকাঙ্ক্ষা সে তোমার কাছেই জানিয়েছি, তুমি যতটা আমায় জানো, বোঝ...."

সুপ্রিয়া ব্যঙ্গ, অভিমান সব ভুলিয়াছে, আর যেন নিজেকে সংযত করিতে পারিতেছে না, বলিল—"বলো।"

স্বর যেন একটু কাঁপিয়া গেছে।

আবেগে আশায় রমেনেরও স্বর গেছে কাঁপিয়া, তাহার মধ্যেই একদমে সবটা বলিয়া গেল :

"একটা ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানি খুলছি সুপা, অনেক জপিয়ে টপিয়ে একটা পার্টনার জোগাড় হয়েছে, কিন্তু বেশি টাকা বের করতে চাইছে না। তুমি তোমার স্বামী মিস্টার লাহিড়ীকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে যদি একটু এদিকে ঝোঁকাতে পার, একটু—তারপর একটা অ্যাপয়েন্টমেণ্ট ঠিক হয়ে

গেলে আমিই খাতাপত্র দেখিয়ে তাঁকে ঠিক করে নি। লক্ষ্মীটি চেষ্টা ক'রো সুপা....মিস্টার লাহিড়ী আমাদের এদিককার ভাষায় যাকে বলে মেডেন সয়েল (maiden soil), সোনা ফলে যাবে। উপকার করা তো হবেই, তা ভিন্ন পিয়োর বিজিনেস হিসেবেই দেখ না—জমিদারি সিসটেম অচল, টাকা আর এরকম ভাবে আটকে রাখলে চলবে? ইনভেস্ট করে দিন, আমি গ্যারাণ্টি দিচ্ছি যদি শতকরা দু'শো টাকা না ফিরে আসে বছর দুয়েকের মধ্যেই....আর উনি টাকা বের করছেন জানলে, সে বেটা কেঁয়ে, মানে, আমার জন্য পার্টনারও যদি ডবল টাকা না ঢালে তো···".

মাতিয়া উঠিয়াছে। পাকা ক্যানভাসারের মতো বাঁ হাতের চেটোয় ডান হাতের মুঠিটা ঠুকিতে যাইবে এমন সময় বেশ একটি প্রমাণ সাইজের মাছ কাছেই দীঘির বুকে লাফাইয়া উঠিল। বাক্যস্রোত একটু বন্ধ রাখিয়া রমেন সেই দিকে খানিকক্ষণ স্থির গাণিতিক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। বোধ হয় রাজ্যের সব দীঘি ইজারা লইয়া মাছের কো-অপারেটিভ ব্যবসার কথাটাও মনে পড়িয়া গিয়া থাকিবে।

হিসাব

বাড়ির ভিতরে পা দিতেই নরেশ আচার্যির কানে গেল—"কালীতারা বলো—"

বিস্মিতভাবে ভাঁড়ার ঘরের দিকে মুখ ফিরাইয়া দেখিল বারান্দায় একটা খাঁচায় একটি টিয়াপাখি টাঙানো। গৃহস্থ মানুষ, পাঁচটা ধান্দায় ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়, নয়দিন পরে বাড়ি ঢুকিতেই এই নূতন উপদ্রবের সাক্ষাতে আচার্যি স্ত্রী মহামায়াকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিল—"টিয়ে কিনলে কবে—কত দিয়ে?"

মহামায়া বলিল—"কিনতে যাবো কেন? দিব্যি কার পড়া পাখিটি নোনা গাছটায় এসে বসল, কামিখ্যেকে দিয়ে ধরিয়ে নিলুম, খাঁচাটা ভাড়াটে বৌ-এর কাছ থেকে চেয়ে এনেছি।"

"কতদিন হ'ল?"

"এই তো বুঝি দিন পাঁচেক হোল।"

"খাচ্ছে কি?"

প্রশ্নে গূঢ় সংকেতটি বুঝিতে স্ত্রীর বাকি রহিল না, বলিল—"খাবে আর কি? এইটুকু তো পেট। চার পয়সার ছোলা কিনেছিলাম, এই আজ ফুরিয়েছে—পাঁচ দিনের দিন।....চমৎকার বলে কিন্তু।"

আচার্যি ওটাকে সোজা হিসেবেই ধরিয়া লইল,—একটা অসহায় জীব, পুরাণো আশ্রয় হইতে বিচ্যুত হইয়াছে, আহারের রুচিটা তো এখন কমই। তাহা হইলে চার দিনে চার পয়সা, ত্রিশ দিনে ত্রিশ পয়সা—বত্রিশ পয়সাই ধরিতে হয়, কেননা বারোটা মাসই তো ত্রিশ দিনে শেষ

হইতেছে না। মাসে আট আনা, বছরে ছয় টাকা, কম করিয়া বারোটা বছরও যদি বাঁচে তো ছ' বারোং বাহাত্তর....

হাত পা ধুইল না, হিসাবটা মনে মনে সারিয়া লইয়া মহামায়ার কাকুতি-মিনতি সত্ত্বেও গিয়া খাঁচার দরজাটা খুলিয়া ধরিল। এই নব পরিস্থিতে পাখিটা ঘাবড়াইয়া গিয়া বেশি করিয়া বুলি আওড়াইতে থাকিলে, উল্টা দিক দিয়া একটা খোঁচা দিয়া বলিল—"মাগ্যি গণ্ডার সময়, বসে বসে 'কালী তারা' বুলি আওড়ে খাওয়ার দিন গেছে; যা, বেরোঃ!"

এটা মূল কাহিনী নয়, প্রায় পনের বৎসর পূর্বের একটা ঘটনা বলিলাম। এ থেকে বোঝা যাইবে আচার্যি লোকটা কি রকম এবং কি সংকট অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে।—

মহামায়ার মাসির টাকা আছে। গেরস্ত ঘরের বিধবা, কত আর থাকিবে?—দশ হাজারও নয়, বিশ হাজারও নয়, তবে হাজার তিন চারের মধ্যে একটা কিছু আছে। বোনপো, ভাইপো, বোনঝি, ভাইঝি, —যাহারা আছে এতদিন গা করে নাই। কারণ বুড়ি একটি দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়াছিল।

ছোঁড়াটা হঠাৎ সেদিন মারা যাইতে সবার টনক নড়িয়াছে। সবাই তাড়াতাড়ি গিয়া জ্ঞাতি-ভাইয়ের শোকে খুব একচোট চোখের জল খরচ করিয়া আসিল; এখন একটা টানাটানি পড়িয়া গেছে—"পিসি আমার এখানে এসো, তো, মাসি আমার এখানে এসো...."

একলা বুড়ো মানুষ, একটা আশ্রয় তো চাই, মাসি ভাবিয়া দেখিতেছে। এই সময় একদিন মহামায়া স্বামীর কাছে কথাটা পাড়িল।

বলিল—"সবাই টানাটানি করছে, কিন্তু মাসির ইচ্ছেটা এখানেই এসে থাকেন।" বাঁহাতে হুঁকা লইয়া আচার্যি কি একটা রোকড় তৈয়ার করিতেছিল, বুড়ির আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে তাহাদের অবস্থাটাই সব চেয়ে ভালো, একটু সন্দেহের দৃষ্টিতে আড়ে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—"কেন?"

মহামায়া বলিল—"কেন আবার? আমাকেই ছেলে'বেলা থেকে সবচেয়ে ভালবাসতেন—'মায়া' বলতে অজ্ঞান হতেন…"

স্থির দৃষ্টিতে একটু আড়ে স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিল। আসল কথা হইতেছে দুজনেই জানে সবচেয়ে দরকারি কথাটা কি, আর দুজনেই চাহিতেছে ও-ই প্রথমে মুখ দিয়া বাহির করুক সেটা। একটু বোধ হয় লুকাচুরি চলিয়াছে। অবশেষে আচার্যিই পরিষ্কার করিয়া দিল, একটু দ্রুত হুঁকা টানিয়া লইয়া বলিল—"কি সময়টা যাচ্ছে দেখছ? এসময় একটা মানুষের ভার নেওয়া…."

আচার্যির পাঁজিতে চিরকালই শনি রাজা, রাহু মন্ত্রী, সব প্রস্তাবের মুখেই ঐ প্রশ্ন করিয়া আরম্ভ করে; মহামায়া বলিল—"বলতে নেই, কিন্তু মালক্ষ্মীর দয়ায় যার গোলায় ধান আছে তার তেমন আর ইয়ে কি? আর…."

একটু আটকাইয়া গেল পরের কথাটা, হাজার হোক বোনঝিই তো। আচার্যি আর কয়েকবার ঘন ঘন তামাক টানিয়া লইয়া বলিল—"আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিলে?"

স্ত্রী বলিল—"বলতে যাওয়া-যাওয়ি আর কি?—গেরস্তকে আবার সব দিক ভেবেচিন্তে দেখতে হয় তো? কিছু আছে মাসির হাতে। তা সেটা অন্য জায়গায় গিয়ে ওঠে সেইটিই কি ভালো?"

বেশ পরিষ্কার ভাবে মন জানাজানি হইতে আর কিছু আটকাইল

না। আচার্যি প্রশ্ন করিল—"কত—তা খোঁজ নিয়েছিলে?—গেলে তো মাসি মাসি করে নাপিয়ে। মাসি তোমার, আমার তো মাস্‌-শাশুড়িই—পষ্ট কথাটাই কেন না বলি?"

"তা নিলুম বৈকি খোঁজ, গেরস্তর আবার সব দিকই দেখতে হবে তো? তবে মাসিকে তো আর বলা যায় না—তোমার সিন্দুকটা খোল তো একবার দেখি....ইসেরায়-ইঙ্গিতে এর-ওর কাছ থেকে একটা আন্দাজ করে নেওয়া। তা ভিন্ন মায়ের-বোন মাসি, কিছু কিছু জানতামও তো ভেতরের কথা?....দশবিশ হাজার কোথায় পাবে? তবে হ্যাঁ, নগদে, গয়না-গাঁটিতে হাজার তিনেকের ওপর হবে। বাড়িটি অবিশ্যি নিজের নয়, বাড়িতো করবার অবসর পেলেন না মেসোমশাই...."

আচার্যি রোকড়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া প্রশ্ন করিল—"কত বয়স হোল?"

"তা মাসির বয়স হোল বৈকি, মার চেয়ে মাত্র তো দু'বছরের ছোট। মা গেল পৌষে মারা গেলেন তেষট্টি বছরে। তাহলে দেখনা কত হলো?....ঐ একটি আছেন, তাও আর ক'দিনই বা বাঁচবেন?"

—মহামায়া চোখের কোণ মুছিল।

আচার্যি মনে মনে হিসাব করিয়া লইয়া স্ত্রীর সহিত সহমত হইতে পারিল না। রোকড়েই দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিল, তবে মুখের একটা দিক খুব বেশি রকম কুঞ্চিত হইয়া গেল। প্রশ্ন করিল—"বালাই, বাঁচবেন নাই বা কেন? কোন অসুখ বিসুখ আছে নাকি তেমন?"

অত্যন্ত সূক্ষ্ম অথচ প্রয়োজনীয় প্রশ্ন, অতি সূক্ষ্ম তির্যক দৃষ্টিতে একবার স্ত্রীর দিকে চাহিল।

উত্তরটাও খুব শক্ত, শাঁকের করাতের মতো দু'দিকেই কাটিবার সম্ভাবনা আছে, মহামায়াকে একটু চুপ করিয়া থাকিতে হইল, তাহার

পর আমতা আমতা করিয়া বলিল—"না, বালাই ষাট, অসুখ বিসুখ থাকতে তেমন যাবে কেন? নিরোগা শরীর আমার মাসির।....তবে আমার কি সেরকম অদেষ্ট হবে যে মাসি টেঁকবেন আমার কপালে বেশিদিন? নিরোগা শরীরকেই যে আবার বেশি ভয়, ভালো গাছটাই যে আগে মট করে যায় ভেঙে..."

আবার চোখে অঞ্চল দিল।

একটু চুপচাপ গেল, লুকাচুরির ভাবটা আবার আসিয়া পড়িয়াছে একটু।

তামাকে বলসঞ্চয় করিয়া আচার্যি বলিল—"না, তা মারা যাবেন কেন? নিরোগা মানুষ বলছ—ভালোই তো। কেউ রোগে ভুগুক এটা কি চায় লোকে, না, চাইতে আছে? আমি জিগ্যেস করছিলাম এইজন্যে—শরীরে রোগ থাকলে, সর্বদা একটা ভয় লেগে থাকে তো?—মানুষটা খেতে পাচ্ছে না, যা খাচ্ছে হজম হচ্ছে না, কখন কি হয় একটা ভয় লেগে থাকে না? সেই কথাই...."

মহামায়া বলিল—"কিন্তু মাসির যে আমার না খাওয়ার মধ্যেই গো। বেরতোতে বেরতোতেই কেটে যায়। একাদশী, আমাবস্যে, পূর্ণিমে, এর ওপর আবার চারটে মঙ্গলবার আছে।....কার কল্যেণেই বা আর করা? কিন্তু সে কথা আর তাঁকে কে বোঝাচ্ছে বলো? বলতে কি কম করেছি আমরা? তা, বলেন—তোরা তো রয়েছিস, তোদের কল্যেণেই করব এবার থেকে...."

শোনার মধ্যেই আচার্যি একবার চমকিয়া উঠিল, যাহা খোঁজা যায় হঠাৎ সেটা পাইয়া বসিলে যেমন হয় ভাবটা। বলিল—"ব্রততে-ব্রততেই বুঝি কেটে যায় সারা মাস?"

"তবে আর বলছি কি? ক'টা দিনই বা আর হাঁড়ি চড়ে? ওদিকে

ঐ গেল, তার ওপর আজ লক্ষ্মী পুজো, তো কাল শেতল ষষ্ঠী, পরশু মনসা পুজো—অদ্দেকটা মাস তো এই করেই কেটে যায়। বলছিলেন না এবার?—খাওয়া দাওয়ার পাট তো একরকম উঠিয়েই দিয়েছি, মায়া, তবু কী মার্কণ্ডের পরমায়ু যে গতরের মধ্যে ঢুকে বসে আছে, কত যে আর সইতে হবে....”

আচার্যির তামাক টানা খুব দ্রুত হইয়া উঠিল, অত্যন্ত অন্যমনস্ক হইয়া উঠিয়াছে; এক সময় মুখটা সরাইয়া লইয়া বলিল—“আচ্ছা, তুমি যাও, একটু ভেবে দেখি, হুট করে একজনের দায়িত্ব ঘাড়ে করা তো সোজা কথা নয়। তায় বুড়ো মানুষ, তার ওপর আবার সম্পর্কে কুটুম।....দেখি ভেবে, তুমি একটু তামাক সেজে দিয়ে যাও তো।”

আচার্যি চালের বাতা হইতে পাঁজিটা পাড়িয়া পুরা এক ছিলিম তামাকের সাহায্যে, সপ্তাহের নয়, মাসের নয়, একটি পুরা বছরের হিসাব করিয়া লইল। তাহার মনটা যেন জুড়াইয়া আসিল—কী চমৎকার ব্যবস্থাই করা শাস্ত্রের! ব্রতয় ব্রতয় ছয়লাপ, নাও না, কত করিবে।

হিসাব করিয়া দেখিল মাস-শাশুড়ির যেমন মতি-গতি, বছরে ছটা মাসও হাঁড়ি চড়াইতে হয় কি না হয়! তাও একবেলা করিয়া, বিধবা মানুষ, রাত্রে তো যা হোক দু'টো ফল, একটু দুধ। এর উপর—আবার অসুখ-বিসুখও আছে—মানুষের শরীরই তো? মাস-শাশুড়ির শরীর আবার শোকে জরজর....আহা, কত কষ্ট যে আমাদের হিন্দু বিধবার!

হিসাবটা টাকা আনা পয়সায় খতাইয়া লইল। বাদ-সাদ দিয়া দিনে গড়ে যদি আনা ছয়েক করিয়াই ধরা যায় তো মাসে এগার টাকা

চার আনা ঃ চুলোয় যাক, ওটা না হয় সোজাসুজি বারো টাকাই হইল। বছরে এইরকম ছ'টি মাস, না হয় সাতটাই, বাকি তো উপোস। তাহা হইলে সাত-বারং চুরাশি। শোকে জরজর শরীর, পাঁচটি বছরের বেশি নয়; তবু আচার্য ওটাকে সাত বছর করিয়া লইল—আহা, বাঁচুন না, কে মানা করিতেছে? পাঁচশ অষ্টআশি—চুলোয় যাক্—ছ'শোই হইল সোজাসুজি। চারিখানা কাপড় আছে বছরে, কাছাকাছি এক আধটা তীর্থও ঘুরাইয়া আনিতে হয় মাঝে মাঝে। আচার্য ওটাকে সোজাসুজি সাতশতই করিয়া লইল এবং আরও একটু ঔদার্য দেখাইয়া একেবারে আটশতে শেষ করিল। তাহা হইলে মাসির পিছনে খরচ শেষ পর্যন্ত আটশত টাকা।

এইবার জমার দিক। যেমন অদৃষ্ট, চার হাজার বলিয়া বিশ্বাস হয় না। আচার্য ওটাকে কম করিয়াই ধরিল—সাড়ে তিন হাজার; হয় চার হাজার, বাকি পাঁচশ' তো উহারই রহিল। তাহা হইলে ৩৫০০৲—৮০০৲, সাতবছরে নগদ সাতাশশ' টাকা। আর টাকাটা তো সুদে খাটিতে থাকিবে, বসিয়া থাকিবে না তো।

আচার্যি হুঁকা রাখিয়া দিয়া খুব ভক্তিসহকারে একটি চিঠি মুসাবিদা করিল ঃ

প্রণামাবহবনিবেদঞ্চাগে!

আপনার নিদারুণ বিপৎপাতে পূর্বেই সর্বকার্য পরিত্যাগ করিয়া আপনার ভাগিনেয়ীকে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। ইদানীং তন্মুখাৎ আপনকার নিদারুণ অসহায় অবস্থার কথা শুনিয়া সেবক নিরতিশয় চিন্তাসাগরে নিমগ্ন আছে। এক্ষণে সেবকের ইচ্ছা, আপনি এই বৃদ্ধাবস্থায় আপনার ভাগিনেয়ী ও সেবকের সেবা গ্রহণ করিয়া জীবনের

অবশেষ কাল ব্যতীত করেন। এই মর্মে বক্তব্য এই যে আপনকার আদেশ পাইলেই স্বয়ং যাইয়া বা উপযুক্ত লোক পাঠাইয়া এই মোকামে আপনার চরণধূলিপাতের ব্যবস্থা করি। যাবৎ আপনকার আদেশ না পাইতেছি তাবৎ আমরা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই নিরতিশয় দুশ্চিন্তাসাগরে নিমগ্ন থাকিব। পরিশেষে বক্তব্য আপনকার উপযুক্ত সেবার উপযোগী সামর্থ ভগবান আমাদের না দিলেও সাধ্যমত ত্রুটি কোন-ক্রমেই হইতে দিব না।

আপনকার শ্রীচরণাশীর্বাদে এ বাটীর সমস্ত কুশল। আমাদের অসংখ্য কোটি প্রণাম গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করিবেন। ইতি—

শ্রীচরণাশ্রিত সেবকাধম
শ্রীনরেশচন্দ্র আচার্য দেবশর্মণঃ।

সাতটা দিন আচর্যিকে নিরতিশয় চিন্তাসাগরে নিমগ্ন থাকিতে হইল, তাহার পর মাসশাশুড়ি পায়ের ধূলি দিলেন।

দিনটা পূর্ণিমা ছিল। কি একটা ধান্ধায় আচার্যিকে বাহিরে যাইতে হইয়াছিল, বেলা আন্দাজ দুইটার সময় ফিরিল।

মাসশাশুড়িকে দক্ষিণের ভালো ঘরটি দেওয়া হইয়াছে। একরকম ধুলাপায়েই আচার্যি তাড়াতাড়ি তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইতে গেল; আসিয়াছেন দয়া করিয়া, মর্যাদা অনুযায়ী কিছু শিষ্ট বচন বলিত হয় তো?

স্ত্রীকে দুয়ারের কাছে দাঁড় করাইয়া নিজে একটু আড়ালে থাকিয়া আচার্যি বলিল—"বলো উনি যে পায়ের ধুলো দেবেন আমার বাড়িতে—এত সৌভাগ্য যে আমার হবে, স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি আমি। আমাদের আর কি ক্ষমতা, নেহাৎ ভালোবাসেন বলে আপন জেনে দয়া

করে এসেছেন। ক্ষমতা নেই, তবে মাথায় স্থান ওঁর, মাথায় করে রাখব এইটে যেন জানেন। মেসমশাই আমাদের কাঁদিয়ে গেলেন, তারপর যেটিকে সম্বল করে নিয়েছিলেন, সেটিকেও নিয়ে নিলেন ভগবান, কিন্তু সে তো আর মানুষের হাত নয়, কি করবেন? এখন আমাদের মুখ চেয়ে, নাতি-নাতনিদের মুখ চেয়ে, ভগবানের নাম করুন আর জপ-তপ নিয়ে থাকুন, তাই তো শেষ পর্যন্ত মানুষের সম্বল....”

আরও অনেক কথা, শেষ করিয়া বলিল—“এইবার বলো প্রণাম করতে আসছি, কখনও শ্রীচরণ দেখবার সৌভাগ্যই হয়নি এর আগে, ভাবলুম, না, আগে পায়ের ধূলো নিয়ে তবে অন্যকথা!”

মহামায়া দুয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইল।

ভিতরে গিয়াই আচার্যির চক্ষুস্থির। যেমন ঊর্ধ্বে, তেমনি বহরে, মাসি যেন আধখানা ঘর জোড়া করিয়া আধঘোমটা টানিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, আর তেমনি স্বাস্থ্য; বয়স যাহাই হোক, আঁটো শরীরে স্বাস্থ্য যেন টলমল করিতেছে। একি সাত বৎসরে বিনাশ হইবার শরীর!

খুব কষ্টে নিজের মনকে গুছাইয়া লইয়া আচার্যি প্রণাম করিবার জন্য নত হইল।

তখন মাসির আড়ালে ওদিকটা নজরে পড়িতে আর যেন উঠিবারও ক্ষমতা রহিল না আচার্যির।—

একটি বড় থালায় দিস্তা খানেক পরোটা, তদুপযুক্ত একটা ডালনা, দুইটা ভাজা। দুইটি মাঝামাঝি সাইজের জামবাটি, একটিতে ঘন ছোলার ডাল, একটিতে খুব ঘন করিয়া জাল দেওয়া সেরখানেক দুধ। মাসির পূর্ণিমার ব্রতর আয়োজন!! এর ওপর একটি রেকাবিতে আর কি আছে ভালো করিয়া দেখিবার আগেই মনে পড়িল—অনেকক্ষণ পড়িয়া আছে, প্রণামের মাত্রা অতিরিক্ত হইয়া যাইতেছে।

ভিতরে গিয়াই আচার্যির চক্ষু

পা ধোওয়াও হইল না, সাজা হুঁকাটা হাতে লইয়া আচার্যি কতদিনের রুগীর মতো মন্থর গতিতে বাহিরের আতা-তলাটায় গিয়া বসিল।.... নিতান্ত কম করিয়া ধরিলেও মাসির খোরাক মাসে ত্রিশটি করিয়া মুদ্রা। বছরে তিনশ পঁয়ষট্টি। তাহার ওদিকে হিসাব করিতে আর সাহসই হয় না—সে যা এক সংখ্যা দাঁড়াইবে! আর ঐ কি শোকে জরজর কুল্যে সাত বছর বাঁচিবার শরীর? দশ বছরের কমে একটু টস্‌কাইবার লক্ষণ নাই, তারপর অন্তত আরও পাঁচটা বছর তো বটেই....

যতই ভাবিতেছে, আচার্যির হাত পা যেন অবশ হইয়া আসিতেছে, নিজের হাতে খাল কাটিয়া তো কুমির ঢোকাইল,—এখন উপায়?

পাউডার বনাম ধূলা

১

এ এক অসহ্য কাণ্ড হইয়াছে, ভুলু আর পারে না; বিছানা থেকে নামিয়া মানুষে কোথায় একটু চলাফিরা করিবে তা নয়, একেবারে গা মোছা, পাটকরা জামা পরা, পাউডার মাখা, চুল আঁচড়ানোর ঘটা; তাহার পরই সোনা ছেলে হইয়া এক বাটি দুধ খাও. তাহার পরেই ঝিয়ের কোল আর পেরাম্বুলেটার ঠেলাগাড়ি! একেই তো সমস্ত বাড়িটাতে একটু ধূলো কি একটু কাদার খোঁজ নাই, যদি কোনরকমে ঝিকে ফাঁকি দিয়া কি মায়ের দৃষ্টি এড়াইয়া বাগানের দিকে গিয়া একটু সংগ্রহ হইল তো বাড়িতে হৈ হৈ পড়িয়া যাইবে; আবার ধোওয়া, আবার মোছা, আবার জামা বদলানো, যেন কতই অন্যায় না করিয়াছে খোকা। অথচ চারিদিকেই তো আরও সবাই রহিয়াছে,—কাহারই বা এত দুর্দশা? সামনের বাড়িতে কাতুদিদির মার খোকা, কখনও জামা-ইজের পরা, কখনও শুধু জামা, কখনও শুধু ইজের, কখনও আবার কিছু নেই—কী যে হয় মনে ভুলুর ওকে দেখিলে! আর ভুলুর কুকুর তো মিছিমিছি, কালো কাপড়ের; কাতুদিদির মার খোকা একেবারে সত্যিকারের কুকুর লইয়া খেলা করে, লাঠি লইয়া পড়ায়, বালিস করিয়া ঘাড়ে শোয়, ঘোড়া করিয়া পিঠে চড়ে! সেদিন যখন ঘোড়াটা ওকে দুম্ করিয়া ফেলিয়া ডাকিতে ডাকিতে রাস্তার দিকে ছুটিয়া গেল, ভুলু আহ্লাদে আপনি-আপনিই হাততালি দিয়া উঠিয়াছিল, জ্যান্ত ঘোড়ার পিঠ থেকে সত্যি সত্যি পড়া খুব মজার নয়? বেশ মনে পড়ে ভুলুর—ওর একবার মনে হইয়াছিল—ও যদি কাতুদিদির মার খোকা হইত

আর কাতুদিদির মার খোকা যদি ওর মার ভুলু হইত তো কি মজাটাই যে হইত!

বেশ, চুল যদি আঁচড়াইতেই হইবে, পাউডার যদি মাখিতেই হইবে তো তাও তো ভুলু নিজেই পারে। পাশের বাড়িতে ও:দের খুকু পারে আর ভুলু পারিবে না কেন? খুকু তো ভুলুর চেয়ে অনেক ছোট, দিদিকে এখনও ডিডি বলে। সেদিন মা যখন ভুলুকে লইয়া পালঙে শুইল, তাহার পর ঘুমাইয়া পড়িল। ভুলু একটু মাথা তুলিয়া জানালা দিয়া দেখিল—খুকু ওর মার এতবড় চিরুণি লইয়া নিজের চুল নিজে আঁচড়াইতেছে, তাহার পর কাজল পরিল, কত পাউডার মাখিল—এক মুখ পাউডার, মা ভুলুকে যা মাখাইয়া দেয় তাহার চেয়ে ঢের বেশি। সব মায়েই দুষ্টু, খুকুর মা আসিয়া সব কাড়িয়া লইয়া খুকুকে মারিল। তা বেশ তো, ভুলুর মাও না হয় মারুক না ভুলুকে; কিন্তু চিরুণি, পাউডারের বাক্স অত উঁচুতে না রাখিয়া খুকুর মায়ের মতন আরশির নিচে টানা বাক্সয় রাখিয়া দিক না।....ভুলুর মা যেন আরও দুষ্টু!

খুকুর মা মারে বড্ড খুকুকে, তবু কিন্তু ভুলু যদি খুকুর মায়ের খোকা হইত আর খুকু যদি ভুলুর মায়ের খুকু হইত তো কী ভালো যে হইত ভুলু ভাবিয়াই কূল পায় না।

যতক্ষণ দুপুর বেলা হয়, ওবাড়িতে খুকুর মাও ঘুমায়, এবাড়িতে ভুলুর মাও ঘুমায়। ওবাড়িতে খুকু রোজ কত নূতন নূতন জিনিষ আনিয়া কত নূতন নূতন খেলা করে, আর ভুলু বালিস থেকে একটু মাথা তুলিয়া জানালার মধ্যে দিয়া দেখে, মনে হয় কাতু দিদির মার খোকা না হইতে পারুক, পাশের বাড়ির খুকুও যদি হইতে পারিত ভুলু, তো আর কিছু দুঃখ থাকিত না।

বিকাল বেলা আবার সেই গা মোছা, চুল আঁচড়ান, পাউডার

মাথা ; আবার ঝি, আবার এক বাটি দুধ খাইয়া সেই পেরাম্বুলেটার।···· সেদিন ঝিয়ের মেয়ে কোঁচড়ে করিয়া মকাই ভাজা খাইতেছিল, কি সুন্দর জিনিষ! কি সুন্দর গন্ধ! মুঠোর সবগুলাও শেষ করে নাই ভুলু, বাড়িতে একেবারে হৈ-হৈ পড়িয়া গেল। ঝিয়ের কাছে তাহার মেয়েটা মার খাইল, মায়ের কাছে ভুলুর শুধু মার খাইতে বাকি রহিল। হাতের মকাই কাড়িয়া ছড়াইয়া ভুলুকে ধমকাইয়া সে কী কাণ্ড! সন্ধ্যা পর্যন্ত ভুলুর কান্না থামে নাই।

এক এক সময় মনে হয়, মা খুব ভালো ; চুমা খাইয়া, বুকে চাপিয়া কত আদর করে, সত্যই মনে হয় মা তাহাকে খুব ভালোবাসে। তবুও এমন কেন? কী ভালো লাগে ভুলুর একেবারেই কেন বুঝিতে পারে না মা? ঝি তো বেশ বোঝে, সে তো বেশ দুধের বাটির বদলে তার মেয়েকে কোঁচড় ভরিয়া মকাই ভাজা দেয়!

মুখ বুজিয়া সব সহিয়া যায় ভুলু, কি আর করিবে?—বাবা, মা, ঝি সবাই যে তাহার চেয়ে অনেক বড়। ঠিক করিয়া রাখিয়াছে যখন ঝিয়ের মেয়ের বাবার মতন বড় হইয়া উঠিবে তখন সব করিবে, খালি গায়ের উপর শুধু একটা গামছা ফেলিয়া গাছে উঠিবে, জলে নামিবে, আর কোথায়-কোথায় চলিয়া গিয়া কত কি যে করিবে, তাহার হিসাব করিয়া উঠিতে পারে না খোকা। অনেক দূরের আরও পরে যে 'কত কি'র দেশ আছে—দিনে মার কাছে যার গল্প শোনে ভুলু, রাত্তিরে ঘুম-বুড়ি যেখানে লইয়া যায়, একেবারে সেইখানে চলিয়া যাইবে।

কিন্তু তাড়াতাড়ি সে বড়ই হইয়া উঠিতেছে না। রোজ সকালে আরশির সামনে গিয়া দাঁড়ায় ভুলু, আশা করে এক আরশি না হোক, অন্তত আধ আরশি বড় হইয়া গেছে, দেখে ঠিক তেমনটিই আছে ; মনটা যে কি হইয়া যায় ভুলুর!

২

ভুলুর স্বপ্নের দেশ শুধু মায়ের গল্পে বা ঘুম-বুড়ির কাছেই নেই, আরও একটা আছে তাহাদের বাগানটার পেছনেই। বাগানের খুব উঁচু দেয়ালের জন্য দেখিতে পায় না ভুলু, কিন্তু মাঝে মাঝে সেখান থেকে কত রকম গলায় কত রকম হাসি, চেঁচামেচি, কত রকম নূতন নূতন কথা যখন ভাসিয়া আসে, ভুলু বেশ বোঝে ওখানে যা' খুশি লইয়া যা' খুশি খেলা করিবার একটা দেশ আছে, ওখানে ছেলেরা মেয়েরা জামা পরে না, পাউডার মাখে না, পেরাম্বুলেটারে চড়ে না; তাদের কাতুদিদির মায়ের খোকার চেয়েও মুক্তি, পাশের বাড়ির খুকুর চেয়েও নিজের হাতে যা' খুশি মাখিবার সুযোগ।....একেবারে বাগানের পাশেই বলিয়া ভুলুর মনটা এক একবার বড্ড কেমন করিয়া উঠে। দুধের বাটিতে চুমুক দিতেছে, খল খল, খিল-খিল করিয়া সেই অনেক রকম গলায় অনেক রকম হাসি উঠিল; চুমুক দেওয়া বন্ধ করিয়া দাঁতে বাটি কামড়াইয়া ভুলু দেয়ালের দিকে চাহিয়া থাকে। এক একদিন দুপুরে সামনের শাদা রোদ্দুর যখন যেন চুপ করিয়া কি ভাবিতে থাকে, ভুলু ঘুমন্ত মায়ের পাশে বালিস থেকে একটু মাথা তুলিয়া—পাশের বাড়ির খুকুর নিজের হাতে কাজল-পরা দেখে, দেয়ালের ওদিকে হঠাৎ সেই রকম কত গলায় কত রকমের শব্দ ওঠে—হাসি, চেঁচামেচি, যা' খুশি তাই—শব্দ বাড়িয়া ওঠে—ওদের মায়ের বকুনীতে আরও বাড়িয়া ওঠে—শুধু বাড়া নয়, শব্দগুলা চারিদিকে যেন ছুটাছুটি করিয়া ফেরে। বেশ বোঝে ভুলু—শুধুই যা' খুশি তাই চেঁচামেচি নয়, কতরকম ছেলে কতরকম করিয়া খেলা করে এই চমৎকার দুপুর রোদ্দুরে—যত খুশি ছুটিয়া যেখানে খুশি শুইয়া বসিয়া, যা' খুশি তাই মাখিয়া।...খুকুর অত চমৎকার কাজল-পরা দেখা ছাড়িয়া ভুলু দেওয়ালের দিকে চায়;

কী যে মনে হয় ভুলুর, পায়ে যেন সুড়সুড়ি লাগে—ইচ্ছা হয় যাই ছুটিয়া—ঝিয়ের মেয়ের বাবার মতন বড় হইয়া উঠিবার আর দেরি সয় না।···ভুলু জানে, তবু দোরের দিকে চায়—একেবারে উঁচুতে লোহার ছিটকিনি দিয়া যেখানে দোরটা বন্ধ করা সেইখানটিতে গিয়া চোখ পড়ে···

ভুলু যে বাহিরে না যায় এমন নয়। রোজ সকালে বিকালে ঝি পেরাম্বুলেটারে করিয়া তাহাকে মা-গঙ্গার ধারের কালো রাস্তা দিয়া বেড়াইতে লইয়া যায়। একটু ভালো লাগে ভুলুর—শুধু বাড়ির চেয়ে ভালো, তার বেশি আর ভালো লাগে না। একই রকম গাছ দেখে ভুলু, একই রকম মা-গঙ্গা, একই রকম রাস্তা ; সকালে যখন যায় দাড়িওয়ালা বুড়ো সেপাই নাহিয়া, লোহার খাঁচায় রাঙা ঠোঁটের পাখি লইয়া—"সীত্তারাম কহো, সীত্তারাম কহো" বলিতে ভুলুর পেরাম্বুলে-টারের পাশ দিয়া চলিয়া যায় ভুলুর খানিকটা ভালো লাগে আর খানিকটা কেমন কেমন লাগে ঠিক বুঝিতে পারে না, শুধু ফিরিয়া দেখে পাখিটা কোন মতেই 'সীত্তারাম' বলিতেছে না। ভুলুর আশ্চর্য বোধ হয়,—খাঁচা কি পাখিদের পেরাম্বুলেটার ?

এরপর থেকেই ভুলুর দেওয়ালের বাইরের সেই জায়গাটার কথা বেশি করিয়া মনে পড়ে। এক একদিন ঝিকে বলে, এদিকে রোজ যেখানে যায় সেখানে না গিয়া মাটির রাস্তা দিয়া ওদিক পানে চলুক না, বেশ হইবে ; কাহারা সব অত খেলা করে ভুলু দেখিবে, পেরাম্বুলেটার থেকে নামিবে না, কিচ্ছু না। ঝি গালে হাত দিয়া হাঁ করিয়া চায়, বলে—"ছি, ছি, ওদিকে কেউ যায় ? যত ছোটলোকেদের বাড়ি, মা শুনলে কি বলবে ?"

ভুলু বলে সে মাকে কখনও বলিবে না। শুধু কাহারা খেলা করিতেছে দেখিবে।

ঝি আরও হাঁ করিয়া পেরাম্বুলেটার দাঁড় করায়, বলে—"ছি ছি খোকা, নোংরা ছেলেরা খেলা করে, ধুলো মাখা ন্যাংটো, তাদের কাছে যেতে আছে নাকি? দুষ্ট তারা সব।"

আবার পেরাম্বুলেটার চালাইয়া যায়। প্রথমে ভুলুর কষ্ট হয়, দুষ্ট ছেলেরাই যে ভালো এটা কেউ বোঝে না কেন? তাহার পর রাগ হয়, ঠিক করে এবার ঝি যখন কিছু বলিবে, সে কোনমতেই কথা কহিবে না। সেপাইয়ের পাখির মতন ঠোঁট দুইটা বন্ধ করিয়া মুখ ভার করিয়া বসিয়া থাকিবে।

তাহার পর একদিন ভুলু তাহার খেলার রাজ্যের পথ আপনিই আবিষ্কার করিয়া ফেলিল।

সেদিন মা ভুলুর বাবাকে বলিল—ডাক্তার বাবুর বৌ এসেচে, ভাবচি বিকালে গিয়ে দেখা করে আসব।" বাবা বললে—"যাও।" পেরাম্বুলেটারে না গিয়ে ভুলু মায়ের সঙ্গে নতুন কাকিমার বাড়ি গেল।

ওদিকে আর কখনও যায় নাই ভুলু। বেড়াইতে যেমন সামনের ফটক দিয়া যায় এ তেমন নয়। বাগানের পাশের দিকের দরজা দিয়া উহারা বাহির হইয়া অন্য রাস্তায় পড়িল, তাহার পর বাগানের অন্যদিকের দেয়ালের পাশ দিয়া চলিল। দেয়ালটা শেষ হইয়া যেখানে আবার ওদিকে ঘুরিয়া গেছে—সেখানে আসিতেই একপাল কালো কালো ছেলে-মেয়ে সামনের একটি সরু রাস্তা দিয়া হাসিতে হাসিতে, চেঁচামেচি করিতে করিতে এ ওর গায়ে পড়িতে পড়িতে একটু আসিয়াই আবার সেইভাবেই ছুটিয়া ওদিকে কোথায় চলিয়া গেল, আর তাহাদের দেখা গেল না। কাহারও হাতে হলদে ফুল শুদ্ধ গাছের ডাল, কাহারও হাতে ছড়ি, কাহারও হাতে আরও কি, ঐটুকু সময়ে ভালো করিয়া দেখা গেল না। ভুলুর যে কি মনে হইল, ইচ্ছা হইল

ঝিয়ের কোল থেকে লাফাইয়া পড়ে। কিন্তু ইচ্ছা হইলেই তো হয় না, তাহার উপর আবার মা রহিয়াছে। বাড়ি থেকে যেমন শোনে সেই রকম হাসি-হল্লা শুনিতে শুনিতে ওরা নতুন কাকিমাদের বাড়ি চলিয়া গেল।

খোকার মনে আছে সেরাত্রে ঘুমের বুড়ি ওকে সেই বাগানের পেছনের খেলার রাজ্যেই লইয়া গিয়াছিল,—কত যে খেলা, কত যে চেঁচামেচি, কত যে হাসি-হল্লা! ভুলু এমনটা আর কখনও দেখে নাই, সে নিজেও কি কম খেলিল—কম ধূলাটা মাখিল!”

পরদিন দেয়ালের ওধারে আবার যখন সেই শব্দ উঠিল, ভুলুর মনটা অন্য দিনের চেয়েও ছটফট করিতে লাগিল, মনে হইল রাত্তিরের যত চেনা শোনা ছেলেমেয়ে সবাই তাহার জন্যও যেন ওদিকে হাঁকাহাঁকি লাগাইয়া দিয়াছে।...জামা জুতা পরিয়া, পাউডার মাখিয়া যখন ভুলু পেরাম্বুলেটারে উঠিল, কান্নায় তাহার গলাটা বুজিয়া আসিয়াছে।

সে-রাত্তিরেও আবার ঘুমের বুড়ি আসিয়া নতুন-চেনা পথে তাহাকে বাগানের ওদিকে খেলার রাজ্যে লইয়া গেল।

তাহার পরদিন মা না ঘুমাইয়া কাকিমাদের বাড়ি গেল দুপুরবেলা। ভুলু রহিল ঝিয়ের কাছে। ঝি যখন ঘুমাইয়া পড়িল, ভুলু আস্তে আস্তে বাহির হইয়া বাগানের ওপাশের দরজা দিয়া ওদিককার রাস্তায় পড়িল। ওদিকে সেই দুপুরে খেলার চেঁচামেচি, ভুলু রাস্তায় নামিয়া একটু অগ্রসর হইল। কেমন একটু একটু ভয় করিতেছে; রাস্তাটাকেই ভয়,—মনে হইতেছে রাস্তাটা যদি না থাকিত, একেবারেই ওখানে গিয়া পড়া যাইত তো বেশ হইত। তবুও একটু অগ্রসর হইল ভুলু; আর খানিকটা গেলেই ঐ খেলার রাজ্যের সরু রাস্তাটা....কিন্তু ভুলুর আর সাহসে কুলাইল না। আস্তে আস্তে ফিরিয়া লক্ষ্মী ছেলের মতন ঝিয়ের পাশটিতে শুইয়া পড়িল।

৩

পরের দিনের কথা ভুলু জীবনে কখনও ভুলিবে না।

সন্ধ্যার একটু পরে অনেক দূরে কোথায় এক সঙ্গে অনেক বাজনা বাজিয়া ওঠার শব্দ হইল। ঝি বলিল—বাজারের মাড়োয়ারীর বাড়িতে বিয়ে আছে, স্টেশন থেকে আলো-বাদ্যি করিয়া বর আসিতেছে। তাড়াতাড়ি ভুলুকে কোলে লইয়া, ভুলুর দাদার হাত ধরিয়া ঝি গঙ্গার দিকের রাস্তার ধারে ফটকটায় গিয়া দাঁড়াইল। বাদ্যির আওয়াজ ক্রমেই বাড়িয়া গেল, আর একটু পরেই কালো রাস্তার চারিদিকে আলোয় আলোয় ছড়াছড়ি। তাহার পরই বরের দল আসিয়া পড়িল—পা পর্যন্ত রাঙা জামা-পরা, হাতে শাদা শাদা চকচকে লাঠি লইয়া কত লোক; রাঙা জামা পরা ঘোড়া, রাঙা জামা পরা হাতি; তারপর দু'টি শাদা ঘোড়ায় টানা প্রকাণ্ড একটা পেরাম্বুলেটার, তার ওপর জমজমে ঝকমকে পোষাক পরা বর, চোখে কাজল, মুখে সিঁদুর, চন্দন—কত কি মাখান, মাথায় টকটকে ঝকমকে পাগড়ি; তার সঙ্গে আরও সবাই, অতটা নয়, তবু খুব সাজগোজ। বরের মাথার ওপর সোনার ছাতা, পেছনে একটা লোক ধরিয়া আছে।....ভুলুর একবার মনে হইল—বৌ কোথায়? কিন্তু তখনই বরের পেরাম্বুলেটার আগাইয়া গিয়া আবার আসিল সাজগোজ পরা ঘোড়া, হাতি, পতাকা হাতে রাঙা জামা পরা ছেলের দল, তার সঙ্গে সঙ্গে মটোর, ঘোড়ার গাড়ি, টমটম, কতরকম জামা কাপড় পরা কতরকম লোক সে সবের মধ্যে।....এর সঙ্গে সঙ্গে কতরকম যে আলো, কী সব বাদ্যি, এত বড় হইয়াছে ভুলু কিন্তু কখনও যদি দেখিয়াছে! কনের কথা আর মনেই রহিল না।

এর ওপর আবার মাঝে মাঝে কতরকম বাজি পোড়ানো!

শুধু তাই নয়, বোধ হয় এসবের চেয়েও যা ভালো লাগিল, অন্তত যা ভুলুর পা দু'টাতে সুড়সুড়ি দিতে লাগিল, তা আগে পাশে পেছনে—সমস্ত বরের দল ঘিরিয়া ছেলেদের নাচ, খেলা, চেঁচামেচি, যা খুশি তাই করা ; কাহারও হাতে একটা ফুলের ডাল, কাহারও হাতে কিছু ; আমোদের চোটে এক একজন রাস্তার ওপরই লুটাইয়া পড়িয়া আবার ছুটিয়া আগাইয়া যাইতেছে।

এত বড় আশ্চর্য কাণ্ড ভুলুর জীবনে আর কখনও হয় নাই। ওর মনে হইল যেন মায়ের মুখে শোনা সাতমহলের রাজকন্যাকে উদ্ধার করিতে যাওয়া রাজপুত্র কোটালপুত্রের গল্পের সঙ্গে ভুলুদের বাগানের ওদিকের খেলার রাজ্যটা কি করিয়া মিশিয়া গেছে।—এত বড় অসম্ভব ব্যাপার ভুলু যেন ঠিক বুঝিতে পারে না। ঠিক মনে হয়, বাজনা-বাদ্যি লইয়া বরের দল যত দূরে যায়, খেলার রাজ্যের কালো ছেলেদের চেঁচামেচি যত আরও কম শোনা যায়, ভুলু ভাবে এইবার বুঝি তাহার ঘুমটা যাইবে ভাঙিয়া, দেখিবে বিছানায় মায়ের কাছে শুইয়া আছে, এইবার বুঝি মা ডাকিবে—"ঝি, খোকার ইজের-জামা নিয়ে আয়তো।" তাহার পর চিরুণি, পাউডারের কৌটা লইয়া বসিয়া যাইবে।....খোকা বেশ স্পষ্ট করিয়া কিছুই বুঝিতে পারে না।

সে রাতে ঘুমের বুড়ির দেশেও কত সব অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল ; এত অদ্ভুত যে ঘুম ভাঙার পর আর স্পষ্ট কিছুই মনে পড়িল না ভুলুর। শুধু যেন কোথায় যাওয়ার, কি করিবার জন্য মনটা সমস্ত দিন কেমন করিতে লাগিল। সে রাতেও আবার ঐ সব কাণ্ড, পরের দিন সমস্ত সকালটাও সেই মন কেমন-কেমন করা। নতুন কাকিমাকে ভুলুর মায়ের বড় ভালো লাগিয়াছে, সেদিন দুপুরে আবার ভুলুকে ঝিয়ের কাছে রাখিয়া গল্প করিতে গেল।



কাহারও হাতে একটা ফুলের ডাল…

৪

ভুলুদের বাগানের পেছনে, দেয়ালের ঠিক পরেই একটা বস্তি। মাঝখানে দু'টা আম আর একটা হলদে ফুলে ভরা সোঁদাল গাছের নিচে খানিকটা ফাঁকা জায়গা, পাশে একটা ছোট ডোবা। এই জায়গাটাকে তিন দিকে ঘেরিয়া কতকগুলা বাড়ি। এই সব বাড়ির ছেলেমেয়েরাই আম-সোঁদালের তলায় চোপর দিন জমা হইয়া ওদিকে ভুলুর মাথায় খেলার রাজ্যের স্বপ্ন রচনা করে।

দু'দিন থেকে ওদের মস্ত বড় একটা উৎসবের আয়োজন চলিয়াছে। তাহার অনুপ্রেরণাটা পাওয়া মাড়োয়ারীদের বিবাহের জলুস্ থেকে। এরাই ছুটিয়া, গড়াইয়া, হাসিয়া, হল্লা করিয়া সমস্ত উৎসবটাকে সেদিন শরীরে মনে মাখিয়া লইয়াছিল। আজ ওদের নিজেদেরই এক বিবাহের জলুস্ বাহির হইবে।

সব একরকম জোগাড় হইয়াছে।

ঘোড়া-ঘুড়ি মিলাইয়া ছয়টা থাকিবে—তাহার মধ্যে তিনটা ছাগলী, দুইটা খাশি, একটা বোকা-পাঁঠা। তাদের শিঙে কলকে ফুল আটকাইয়া, পিঠে ছেঁড়া কলাপাতার মখমলের ঝালর বাঁধিয়া সাজাইবার চেষ্টায় একদল মাতিয়া আছে। কতরকম পাতাসুদ্ধ ডালের কত রকম পতাকা! আলোয়-আলোয় তো ছয়লাপ হইয়া গেছে—হলদে ফুলে ভরা সোঁদাল গাছটার প্রায় অর্ধেকটা উজাড় হইয়া গেছে। বাজনাবাদ্যির ঢালোয়া ব্যবস্থা,—গোটা-দশেক পেঁপেডাঁটার বিলাতি শানাই, কলা-পাতার ডাঁটার পটপটি করিয়া ঝাঁঝর করতাল হইয়াছে। একটা একদিক-ছেঁড়া আসল ঢোলও জোগাড় হইয়াছে। বাজনার মহলায়

সমস্ত জায়গাটা গমগম করিতেছে। সবচেয়ে ভালো পাওয়া গেছে হাতিটা,—কাছেই ডোমপাড়া, একটা শূওর ছিটকাইয়া আসিয়াছিল, তাহাকে ধরিয়া-বাঁধিয়া ডোবায় চোবাইয়া পরিষ্কার করিয়া এখন তাহার গায়ে মাথায় হাতির-মতন প্রসাধন হইতেছে। কী শুঁড! কী হাতির মতন ছোট ল্যাজ! কী কালো কালো ব্রোমে ভরা হাতির মতন ঢলঢলে শরীর! এত সত্যিকার কাছাকাছি কোনটাই হয় নাই। হুল্লোড় পড়িয়া গেছে তাহাকে লইয়া।

এদিকে একদল বর-কনে সাজান লইয়া পড়িয়াছে। কাছেই ফুলপাতা দিয়া সাজানো বর-কনের গাড়ি,—রাস্তার ময়লা-ফেলা একটা একচাকার টিনের গাড়ি,—কাছের ডোমপাড়া থেকেই সংগ্রহ হইয়াছে। ছাগলকে রাজি করা গেল না, তাই দুইটা ওরই মধ্যে একটু ফরসা গোছের ছেলেকে শাদা ঘোড়া করিয়া জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহারা যথারীতি পা ঠুকিতেছে আর লাগাম চিবাইতেছে। গাড়ির পেছনে একটা পাকা পেঁপে-পাতার ছাতা লইয়া একটি ছেলে মোতায়েন হইয়া আছে।

এমন সময় হঠাৎ একদল ছেলে চীৎকার করিয়া উঠিল—"আরে খোকাবাবু! খোকাবাবু! খোকাবাবু এসেচে।"

দেখা গেল সরু রাস্তাটা যেখানে আসিয়া ফাঁকা জায়গাটায় পড়িয়াছে সেখানে বাগানের ওদিককার বাঙালী বাবুর ছোট ছেলে দাঁড়াইয়া; খালি পায়ে হাঁটু পর্যন্ত ধূলা, ইজেরের উপর একটা পরিষ্কার নীল জামা। খোকাবাবু মুখে চারিটা আঙুল পুরিয়া উৎসব আয়োজনের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

বিবাহ মিছিলের এমন অভিজাত দর্শক পাইয়া একটা সোরগোল পড়িয়া গেল। প্রায় সমস্ত দলটা চেঁচামিচি করিতে করিতে আসিয়া খোকার সামনে জড়ো হইল।

খোকা এতক্ষণ আর একটু আড়াল থেকে সব দেখিতেছিল—কী অপূর্ব্ব জায়গা কী যা-খুশির ব্যাপার। যত খুশি ফুল-ফুটান গাছ; যেদিকে খুশি মুখ-ফেরান বাড়ি-ঘর, যেমন খুশি সেই রকমভাবে দাঁড়াইয়া আছে—কোনটার মাথায় রাঙা-খোলা কোনটার মাথায় ভাঙা-খোলা, কোনটার খড়ের চাল, কোনটার খড়ের মধ্যে দিয়া বাঁশবাতা বাহির হইয়া আসিয়াছে, কেহ যেন কিছু বলিবার নাই, শাসন করিবার নাই।....ডোবায় হাঁসের পাল, নামিতেছে, উঠিতেছে, সাঁতার কাটিতেছে, ডুব দিতেছে। আর এই খেলার সরঞ্জাম! কত ছেলে,—ন্যাংটো, কোমরে শুধু ঘুন্‌সি, কাহারও কোমরে ছোট্ট একফালি কাপড়, কাহারও ময়লা, ছেঁড়া হাফপ্যাণ্ট, কাহারও শুধু গায়ে একটা বড় জামা—ওই রকম মেয়েরাও।....শূওর, পিঠে পাতার ঝালর দেওয়া-ছাগল, শিঙে ফুল! আর কত রকম বাজনা!....ভুলুর যেন আবার সেই বিয়ের দিনের মতন মনে হইতেছে—এখনই মায়ের কোলের কাছে জাগিয়া উঠিবে যেন....

নিঃসাড়ে কখন আগাইয়া রাস্তার মুখটিতে আসিতে ছেলে-মেয়েরা "খোকা বাবু! খোকা বাবু!" করিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইল।...

ভুলু যেন কিরকম হইয়া গেছে, লজ্জা, একটু বোধ হয় ভয়, আর তার সঙ্গে আস্তে আস্তে অনেকখানি আনন্দ। প্রথমটা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর প্রশ্নে, মন্তব্যে, প্রশংসায়, আদরের মিষ্টি কথায়, সবার ওপোর ওদের আহ্লাদের ছোঁয়াচ লাগিয়া ভুলুর মনটাও যেন বাহির হইয়া আসিতে লাগিল, হাত পা যেন হাল্কা হইয়া আসিতে লাগিল।

"খোকাবাবু, তামাসা দেখতে এসেচ?"

ভুলু মাথা নাড়িল।

একটু গুজগুজ চাপা খুশির হাসির পর—

"খোকাবাবু, খেলবে আমাদের সঙ্গে ?"

ভুলু এবার কথা কহিয়াই বলিল—"খেলব।"

বিয়ের দিন রাস্তায় যেমন ফুলঝুরির বাজি হইয়াছিল, যেন সেই রকম গোছের একটা কাণ্ড হইল,—"খোকাবাবু খেলবে! খোকাবাবু খেলবে!" শব্দে সমস্ত জায়গাটা ভরিয়া গেল, তাহার সঙ্গে হাসি, হাততালি; কত ছেলে ডিগবাজিই খাইয়া গেল,—আহ্লাদে সে কি করিবে যেন ভাবিয়া পাইতেছে না।....খোকাকে সঙ্গে করিয়া সবাই উঠানের মাঝখানে লইয়া গেল। বুঝাইয়া দিল কোন্‌টে হাতি, কোন্‌টে ঘোড়া, কোন্‌টে আলো, কোন্‌টে বাঁশি; তাহার পর আসল জায়গায় লইয়া আসিল—যেখানে বর-কনেকে সাজানো হইতেছে।

খোকার বয়সী বর, একটু ছোট কনে।

গায়ে যত খুশি ধুলা, তাহার উপর সাজানো হইতেছে কত টিপ, কত ফুল, কত কি! কনের মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া ধুলোয় মাখা রাঙা রাঙা চুল, কোমরে একটা ছোট্ট ময়লা কাপড়, একেবারে নূতন লোক দেখিয়া একটু জড়োসড়ো হইয়া গেছে।

বোধ হয় এক সঙ্গে অনেকক্ষণ ঘোরাফিরা করার জন্য সবার সাহস বাড়িয়া গেছে। একজন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল—"খোকাবাবু, তুমি বিয়ে করবে ?"

জিনিষটা এমন লোভনীয়, তিন বছরের ছেলেরও রাজি হইতে আটকায় না, আশী বছরের বুড়োরও রাজি হইতে আটকায় না, ভুলু বিনা বিচারেই ঘাড় নাড়িয়া বলিল—"করব।"

এর পরে যে আহ্লাদের ফুলঝুরি ছুটিল, তাহার কাছে আগেরটা যেন কিছুই নয়।....দিকে দিকে কত ছেলে ছুটিয়া গেল, কত ফুল আসিল, কত কি আসিল এত সুন্দর আর সব দিক দিয়া এত উপযুক্ত

বর পাইয়া মৌলিক বরকে সঙ্গে সঙ্গে বরখাস্ত করিয়া ভুলু বাবুকে তাহার স্থানে বসান হইল ; প্রসাধন আরম্ভ হইয়া গেল।

গঙ্গার লালচে মাটি দিয়া মুখময় চন্দনের ফোঁটা, যেটুকু জায়গা বাকি রহিল পুঁইশাকের পাকা ফলের বেগুনে রং দিয়া কত রকম রেখাচিত্র, পায়ে পুঁইয়ের রসের আলতা, আরও কত রকম দাগ। কামিজের পকেটে ফুল, কলারের চারিদিকে ফুল ; মাথায় খুব বেশি ফুলওয়ালা একটা সোঁদালের ছোট ডাল বাঁধিয়া মাথার টোপর হইল, টোপর, মুকুট, পাগড়ি যা বলিবার অভিরুচি হয়। ভালো বর পাইয়া কনেকে আরও ভালো করিয়া সাজান হইল, শরীরের যেটুকু থালি ছিল পুঁইয়ের রস আর গঙ্গার লাল মাটিতে ভর্তি করিয়া দেওয়া হইল।

ওদিকে মিছিলও সাজিয়া উঠিল,—সব আগে বাজনা, তাহার পর আলো, তাহার পর ঘোড়া, তাহার পর হাতি, তাহার পর বরের গাড়ি। বরের গাড়ির পেছনে আবার ঘোড়া, আবার পতাকা, আবার বাজনা, আবার আলো।

কনেকে তুলিয়া ঠেলা গাড়ির একদিকে বসান হইল। ভুলুর আহ্লাদে যে মনটা কি হইতেছে! পেরাম্বুলেটারে চড়িয়া চিরকালটা কাটিল, কখনও সে এমন ভাবে, এমন পেরাম্বুলেটারে চড়িতে পাইবে কল্পনাও করিতে পারে নাই।

* * *

বাজনা আরম্ভ হইয়া গেল। সমস্ত মিছিলটায় যাত্রা সুরুর একটা চঞ্চলতা পড়িয়া গেল।

বরকে হাতের দোলায় করিয়া কয়েকজন বড় গোছের ছেলে উঠাইয়া গাড়ির কাছে লইয়া গেছে, এইবার গাড়িতে তুলিবে, এমন সময় একটা উৎকট চীৎকারে সবাই একেবারে জড়ভরতের মতন হইয়া

দাঁড়াইয়া পড়িল, দেখিল সরু রাস্তার মুখে ছোট একটি দল লইয়া আফিসের কোটপ্যাণ্টে স্বয়ং বরকর্তা! মুখের চেহারা দেখিলে বোধ হয় না ছেলের বিবাহের এমন চমৎকার যোগাযোগে এতটুকুও খুশির ভাব আছে। অবস্থাটা বুঝিবার আগেই একটা মেয়েছেলে একেবারে পাগলের মতন হইয়া এদিক পানে ছুটিল—মুখে—"খোকা বাবু! ভুলু বাবু! সর্বনাশ! তুমি এখানে?—আর আমরা সমস্ত শহর এক করে ফেললাম....কী ডাকাতে ছেলে রে বাবা!....ভুলুর বাবা অবশ্য তখনই চলিয়া গেলেন কিন্তু এদিকে এক মুহূর্তেই সব ওলটপালট হইয়া গেল। কোথায় যে কে গেল,—হাতি, ঘোড়া, আলো, বাজনা, ছেলে, মেয়ে, এক মুহূর্তেই যেন সব মিলাইয়া গেল।

প্রতি রাতের ঘুমের বুড়ির দেশের মতন এমন একটা ওলট পালট যে, গলায় অত কান্না ঠেলিয়া আসিলেও ভুলু কাঁদিতে পারিল না, একটু হাত পাও ছুঁড়িতে পারিল না। নিচে থেকে কুড়াইয়া বুকে চাপিয়া কত কি বলিয়া চেঁচাইতে চেঁচাইতে ঝি যখন সরু রাস্তার মুখে, তখন ভুলু একবার ঘুরিয়া দেখিল সেই ফাঁকা খেলার-রাজ্যে টিনের পেরাম্বুলেটারে বসিয়া কনে শুধু হাত পা আছড়াইয়া দারুণ কান্না জুড়িয়া দিয়াছে। রাগে, আরও একটা কিসে কান্নার মতনই একটা আওয়াজ করিয়া ভুলু ঝিয়ের কোলে হঠাৎ ছটফট করিয়া উঠিল।

মায়ের গল্পের রাজপুত্র সাতমহলের রাজকন্যাকে উদ্ধার করিতে চলে....তাহারই কথা কি ভুলুর হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল?

গড়ের বাদ্যি

একটি প্রায় সত্তর বৎসরের বৃদ্ধা দোড়গোড়ায় বসিয়াছিল, আমি সামনে গিয়া পড়িতেই অর্ধেক ঘোমটা টানিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। স্বরূপ মণ্ডল আমাকে দেখিতে পাইয়া চরকার হাতটা থামাইয়া অভ্যর্থনা করিল—"আসুন দাদাঠাকুর, পাতঃপেন্নাম হই। এবারে অনেক দিন বাদ দিয়ে এলেন মসনেতে।"

বলিলাম—"সে ছিল বোমার ভয় স্বরূপ, পালিয়ে পালিয়ে আসতে হোত। নৈলে কলকাতার লোকের বাইরে আসা যে কী শক্ত বুঝবে না তো। আমরা এক আলাদা জীবই হয়ে দাঁড়াই যে।"

মোড়ার উপর গিয়া বসিলাম, স্বরূপ নাতিকে তামাক আনিতে বলিয়া আলাদা জীবের কথায় একটু হাসিয়া হাতটা চালাইতে চালাইতে বলিল—"তারপর খপর কি কন শুনি!"

বলিলাম—"খবর তো দেখতেই পাচ্ছ? যারা ম'ল এখন তাদের কথা ভেবে হিংসে হচ্ছে, তবু কোমরে একখানা করে কাপড় শুদ্ধ মানে মানে সড়ে পড়েছে, এখন চালের এক রকম ব্যবস্থা হয়েছে, বাঁচতেই হবে, কিন্তু...."

স্বরূপ 'কিন্তু'র পরের অবস্থাটা কল্পনা করিয়া লইয়া একটু হাসিয়া আবার হাতটা থামাইয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া বলিল—"গদার মাকে তো এতক্ষণ সেই কথা বলছিলুম দাদাঠাকুর, বলি দেখে রাখ— এত বড় কারবারটা চালাচ্ছে তার ভোজবাজিটা একবার দেখে রাখ— গোড়ায় চরখা, তাঁতীর তাঁত; তারপর দিনকতক বিলিতী কলের কাপড়

এলাহি কাণ্ড, কে কত পরবি পর ; তারপর ঢো উঠলো আগুনে দে ওগুনোকে ; তারপর স্বদিশী কল, আবার নেও কত কাপড় নেবে ; তারপর এখন এক কথায় বাজার ফরসা ; আবার ডাক তাঁতীকে, নে আয় চরখা।...চারকুড়ি বয়েস হতে চলল, অনেক...."

এমন সময় খানিকটা দূরে কোথায় ঝমঝম করিয়া ব্যাণ্ডের আওয়াজ উঠিল। স্বরূপ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল, ও-প্রসঙ্গটাই ছাড়িয়া দিয়া স্বরটা খাদে নামাইয়া বলিল—"গড়ের বাদ্যি !"

একটু যেন ব্যঙ্গ হাস্য করিয়া আবার চরখা চালাইতে সুরু করিয়া দিল।

স্বরূপের এই সব অতি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য, হাসির টুক্‌রা প্রভৃতির অন্তরালে বড় বড় গল্প লুকাইয়া থাকে, প্রশ্ন করিলাম—"হাসলে যে মোড়লের পো ?"

স্বরূপ বলিল—"এই চারকুড়ি বয়সের মধ্যে মসনেতে শুদু একটি বার বাদ্যি শুনেছেনু দাদাঠাকুর, হ্যাঁ, যাকে গড়ের বাদ্যি বলতে হয় ! আর একি ছেলেখেলা। মেয়েরা ঐদিকে উলু দিচ্ছে আর ঢাক আর দুটো পেতলের বাঁশি নিয়ে—ভ্যাঁপ্পো ভ্যাঁপো, ভ্যাঁপ্পো ভ্যাঁপো, কি না ? মিত্তিরদের মেয়ের বিয়েতে গড়ের বাদ্যি হচ্চে ! বাজনাটার জাত মেরে দিলে বেটারা দাদাঠাকুর হাসি কি সাদে আসে ? অনেক দুঃখে।"

স্বরূপের নাতি তামাক লইয়া আসিল। হুঁকাটা হাতে লইয়া বলিলাম—"একটু অন্য জায়গায় বরাৎ ছিল, তা একটু বসে শুনেই যাই খাঁটি গড়ের বাদ্যির ব্যাপারটা কি। নাও, শুরু করো।"

স্বরূপ বলিল—"তা বৈকি দাদাঠাকুর, গড়ের বাদ্যি একবার শুনে যদি জীবন ভোর না মনে গেঁতে বসে রইল তো তাকে আবার গড়ের বাদ্যি বলতে হবে ?....তা হলে দিন একটু পেসাদ পেয়ে নি।"

বাঁ হাত দিয়া ডান হাতটা স্পর্শ করিয়া স্বরূপ কলিকাটা তুলিয়া লইল, কয়েক টান দিয়া আবার সেইভাবে বসাইয়া রাখিয়া বলিল—"আমার বয়স তখন কতই বা হবে,—এই ধরুন দশ, তার বেশি নয়; সেই সময়কার কথা। চৌধুরী বাড়ির কত্তা ত্যাখন দামোদর চৌধুরী। মানুষটো যে কেমন ছেল তা কি করে বোঝাই আপুনিকে? সে ধরণের মানুষই যে নোপাট হয়ে গেল ধরাতল থেকে। ইয়া গোঁফ, ইয়া গালপাট্টা, এই টানা চোখ, এই টানা ভুরু; এদিকে যেমনি লম্বায় তেমনি আড়ে। গলার আওয়াজ ছিল তেমনি, একটা যদি হাঁক দিলেন তো সদর থেকে অন্দর পর্যন্ত ঐ অত বড় দেউড়িখানা যেন গম গম করতে থাকত। ঐ যে বন্নু দাদাঠাকুর? সে ধরণের মানুষ নোপাট হয়ে গেল ধরাতল থেকে তো আপুনিকে বোঝাই কি করে?

"দোষ কি ছেল না? ছেল। অব্বিশ্যি এখনকার হিসাবে বলছি, ত্যাখনকার দিনে জমিদারের মধ্যে সেগুলো দোষের মধ্যে ধরবার রেওয়াজ ছেল না। তা, না ধরলেই যে দোষের হবে না এমন কথা তো নয় দাদাঠাকুর। চৌধুরীদের বংশটাই একটু কি যে বলে, ইয়ে ছিল; তার মধ্যে আবার দামোদর চৌধুরীর দাপট পূর্বের সবাইকেই গেছল ছাড়িয়ে। ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া, কি মানুষকে মানুষ গুম করে ফেলা এগুনো তো ধত্তব্যের মধ্যেই ছেল না, ডাকাতি করে গাঁ কে গাঁ লুটে নিয়ে আসা পয্যন্ত নিত্যিকার ব্যাপার ছেল। তবে নিজের জমিদারিতে নয়। তুমি পাশের জমিদার, মাথা তোলবার চেষ্টা করচ, সমস্ত জমিদারি তচনচ করে এমন ঠাণ্ডা করে দিলে যে আর দু'পুরুষ ধরে মাথা তোলবার যো রইল না। তা, একেবারে ঠাণ্ডা তো করা যেত না, কেন না সবারই নিজের নিজের নেটেড়ার দল ছেল, তাই অষ্টপহরই দাঙ্গা ফেসাদ লেগে থাকত দাদাঠাকুর, দেশটা এমন জুড়িয়ে

যায়নি। আজ দামোদর চৌধুরীর দল কার্ত্তিকপুরের রায়েদের জমি-দারিতে পড়ল তো কাল রায়েদের দল মসনের আশে পাশে এসে হানা দিলে, কিছু মাথা নিয়ে গেল, কিছু মাথা রেখে গেল, এই রকম। আপনি আমি রেয়ৎ, কিছু খোয়ালুম, না হয় দু'একজন জানই দিলুম, কিন্তু সমস্ত ধকলটা তো ওনাদেরই সামলাতে হোত দাদাঠাকুর? তা, ঠাণ্ডা মেজাজে তো সে হবার যো নেই, তাই একটু একটু করে নেশাপত্তর এসে পড়তই, দামোদর চৌধুরীর ওপর ধকলটা ছেল বেশি, তাই নেশারও একটু বাড়াবাড়ি ছেল; শাদা চোখে তানাকে বড় কম দেখেছি দাদাঠাকুর। ঐ যে পদ্ম পলাশ লোচনের মতন দু'টি চোখ, সব্বদাই রক্ত জবার মতন রাঙা টকটক করতো। শুধু দু'টি মাস ছেল শাদা, একদিন দু'দিন করে গোনাগুনতি দু'টি মাস তাইতেই চারিদিকে সামাল সামাল রব উঠে গেছল।"

মন্তব্যটা একটু নূতন ধরণের হওয়ায় হুঁকা থেকে মুখ সরাইয়া বলিলাম—"বুঝলাম না স্বরূপ।"

স্বরূপ বলিল—"সবটা না শুনলে বুঝবেন না।"

তূলা ফুরাইয়া গিয়াছিল, নূতন খানিকটা লইয়া আবার সূতা কাটা চালু করিয়া বলিতে লাগিল—"ময়নাগাছির চিন্তামণি ঠাকুর ছিলেন দামোদর চৌধুরীর বোনাই। ওনাদের পদ্ধবি রায়-রায়ান। নবাবী আমলে মস্ত বড় তালুক ছেল, এদিকে এসে মাত্তোর কয়েকখানা গ্রামে ঠেকেছিল। তা বিষয় সম্পত্তি তো পদ্মপত্রের জল দাদাঠাকুর, সব সময় সমান থাকে না; তবে চিন্তামণি ঠাকুর নিজে বড় ধড়িবাজ লোক ছিলেন, আর সুমুন্দির ওপর তাঁর দাবটা ছিল খুব বেশি রকম। লোকে বলত দামোদর চৌধুরীর মাথায় যত রকম কু মতলব খেলত তার বারো আনা চিন্তামণি ঠাকুরের। মসনে থেকে ময়নাগাছি বেশি দূরও নয়, যাওয়া

আসাটা নেগেই ছেল। নেশার দোষটা ওনার আবার একটু বেশি ছেল, বোনাই স্বমুন্দি একত্তর হলে বেশ একটু বাড়াবাড়ি হোত।

"একদিন পাল্কি থেকে নেবে চিন্তামণি ঠাকুর বললেন—'দামোদর ভেবে দেখলুম সংসারটা কিছুই নয়, আমরা হীরে ফেলে কাচে গেরো দিয়েছি। বড়ই অনুতাপ হচ্ছে মনে।'

'অন্য এক পাল্কিতে একজন বোষ্টম বাবাজী বসে ছেল। দামোদর চৌধুরীর দাপটের কথা শুনে নামতে হেম্মৎ পাচ্ছেল না; চিন্তামণি ঠাকুর নিজে গিয়ে তেনাকে ডেকে নিয়ে এলেন। তিনজনে গিয়ে বৈঠকখানায় ঢুকলেন।

"কি মন্তর ঝাড়লে নারায়ণ জানেন দাদাঠাকুর, তারপর দিন থেকেই দামোদর চৌধুরী একেবারে অন্য মানুষ। আমার বাবা ছেল চৌধুরী মশায়ের খানসামা, হুকুম হোল নেশাপত্তোরের যা কিছু সরঞ্জাম সব বড় পুকুরের একেবারে মাঝখানে গিয়ে ডুবিয়ে দিতে হবে। দলের যে সব নেটেড়া ছেল সবার লাঠি একত্তর করে দেউড়ির সামনে খোলকত্তাল বাজিয়ে জ্বালানো হোল; কালীমন্দিরে রোজ জোড়া পাঁঠা পড়ত, তার জায়গায় চারটে করে চালকুমড়োর ব্যবস্থা হোল। হপ্তা-খানেক থেকে, বেশ মোটারকম বিদেয় নিয়ে বোষ্টমবাবাজী বিন্দাবন চলে গেল; চিন্তামণি ঠাকুর সঙ্গে রইল, তেনা আবার আরও বেশি করে ভিড়ে গেছল কিনা, সংসার একরকম ত্যাগ করেই ল্যাঠা চুকিয়ে এসেছিল।

'পাঁঠার জায়গায় কুমড়ো বলি হোক, তাতে এমন কিছু যায় আসে না দাদাঠাকুর, কাল হোল, এর সঙ্গে ঝোঁক চাপল লোকের ভালো করবার। রাস্তা থেকে টেনে নিয়ে এসে ভালো করবার ঘটায় লোকের পথ চলা দায় হয়ে উঠল দাদাঠাকুর। দান, ধ্যান, পুকুর খোঁড়ানো, ঘটা করে

মন্তর দেওয়ানো—এইসব নানান কাণ্ডয় হুহু করে টাকা বেরিয়ে যেতে লাগল! আগে লুট তরাজে মালক্ষ্মীর কিরপেয় একটা নিত্যিকার আয় ছেল, এখন স্থদুই খরচের পালা—দিন কতকের মধ্যেই ত'বিল ফাঁক হয়ে এল। ওদিকে রাণীমা, এদিকে দাওয়ানজী বুঝুতে লাগলেন, কিন্তু কে কার কথা শোনে? মাথায় সেঁদ্ধে বসে গেছে চিরকাল পাপ করে এলুম এবারে মুণ আদা খেয়ে পুণ্যি করতে হবে। আর বিষয় সম্পত্তি নিয়েই তো যত পাপ? ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলবার জন্যে হাঁপিয়ে উঠলেন দামোদর চৌধুরী।

"কেরমে কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়ল : দামোদর চৌধুরী মেয়ের বিয়ে দিয়ে জামাইয়ের হাতে বিষয় সম্পত্তি সঁপে বিন্দাবনে গিয়ে বাস করবেন। এত বড় জমিদারি, এমন সম্পত্তি, আর ওয়ারিশ মাত্র ঐ মেয়ে, অনেকের নোলাতেই জল এল, চারিদিক থেকে ঘটকের আমদানি হতে লাগল। আর সব সম্বন্ধ যা এল তা এল, একটা সম্বন্ধ এল কুসমির জমিদারের বাড়ি থেকে। সবার ধড়ে যেন প্রাণ এল।"

প্রশ্ন করিলাম—"খুব ভালো বংশ বুঝি?"

"অতবড় পাজি জমিদার বংশ এ তল্লাটের মধ্যে আর ছিল না দাদাঠাকুর; তার ওপর মসনের এনাদের সঙ্গে সাতপুরুষের আড়াআড়ি। মসনের এনারা যদি উত্তুর দিকে যায়, কুসমির ওনারা যাবে দক্ষিণ দিকে; কুসমি যদি মসনের সং বের করে তো মসনে কুসমির বাবুদের নিয়ে যাত্রার পালাকে পালা বেঁধে ফেলে; এর ওপর দাঙ্গা-ফ্যাসাদ তো বছরে দু'তিনটে লেগেই আছে। তবে যে বল্ল ধড়ে প্রাণ এল, তার হেতু হচ্ছে—সবাই ভাবলে কুসমির ওখান থেকে বিয়ের সম্বন্ধ, দামোদর চৌধুরী গালমন্দ করে জবাব দেবে, ওদিক থেকেও ওতোর গাইবে, আবার রক্ত গরম হয়ে উঠবে দামোদর চৌধুরীর, আবার আগেকার দিন ফিরে

আসবে, রক্ত ঠাণ্ডা হয়েই যত সব অনথ হতে নেগেছে তো? কিন্তু বোষ্টম বাবাজী দামোদর চৌধুরীর আর কিছু বস্তু রেখে যায়নি দাদাঠাকুর। ঘটক এল সকালে, দাওয়ানজী নিজে গিয়ে এত্তালা দিলেন, কিছু কিছু কান-ভাঙানিও যে না দিলেন এমন নয়, তখুনি তখুনি উত্তর না দেওয়ায় সবাই আশা করলে দিন বুঝি ফিরল, বাগ্দিপাড়ায় দলের যারা কত্তার হুকুমে লাঠি ছেড়ে খোল-কত্তালে হাত পাকাচ্ছেল তারা পয্যন্ত নোতুন লাঠির জোগাড়ে বেরুল, বেশ একটা সাড়া পড়ে গেল ভেতরে ভেতরে; এমন কি এও আশা করলে অনেকে যে বৌনিটা বুঝি ঘটকের ওপর দিয়েই হবে, তানাকে আর আস্ত ফিরতে হবে না মসনে থেকে।

"বিকেল বেলা বৈঠকখানায় ঘটকের ডাক পড়ল। দামোদর চৌধুরী নিজে উঠে তানাকে খাতির করে বসালেন। বোষ্টমদের আবার একটা আইন আছে না দাদাঠাকুর যে ঘাসের চেয়েও নিচু হয়ে থাকতে হবে লোকের কাছে? সেইভাবে কত নিচু হয়ে বিনিয়ে বিনিয়ে বললে—'কুসমির সঙ্গে সম্বন্ধ সে তো আমার পরম সৌভাগ্যি, আমার বংশের সৌভাগ্যি, আমার মেয়ের কি এত কপালের জোর যে কুসমির দেউড়ির এককোণে তার ঠাঁই হবে?' মানে, সত্যি কথাটা বলব না মনে মনে পাকা করে নিলে লোকে যত বাড়িয়ে বলতে পারে আর কি। আসল কথা, ভালো হবার বাই চেগেছে কিনা, তা যে যত বড় শত্রু, তার সঙ্গে তত বেশি আত্তিস্থ না দেখালে তো ভালো হওয়া হবে না, তাই সমস্ত দিন ভেবেচিন্তে ঐ সাব্যস্ত হয়েছে, মানষের সঙ্গে বৈরী ভাব একেবারে মিটিয়ে ফেলতে হবে কিনা, বোষ্টম বাবাজী যে কানে মন্তোর ফুঁকে দিয়ে গেছে। ঘটক একখানা রূপোর থালা, একটা রূপোর বাটি আর একটা রূপোর গেলাস বিদেয় নিয়ে ফিরে গেল। একেবারে অনেক আশা করেছেল, মসনের লোক যেন একেবারে মুশড়ে পড়ল। ঠিক এক মাস

তের দিন পরে বিয়ের দিন ধায্য হোল।....পেসাদ আর আছে দাদাঠাকুর ?"

হুঁকাটা বাড়াইয়া ধরিতে কলিকাটা তুলিয়া লইয়া স্বরূপ বেশ সযত্নে কয়েকটি টান দিল, তাহাতে সব সত্বটুকু নিঃশেষিত হইয়া যাওয়ায় নাতিকে ডাকিয়া আবার নূতন করিয়া কলিকাটা সাজিয়া আনিতে বলিয়া আবার চরথার সঙ্গে সঙ্গে কাহিনীটা আরম্ভ করিল—"এক মাস তের দিন পরে বিয়ের দিন ধায্য হোল। দেউড়িতে তো হাহাকার পড়ে গেল দাদাঠাকুর। চৌধুরী মশাইয়ের মেয়ের নাম ছেল দুর্গা। তা অমন চেহারা মিলিয়ে নাম এপয্যন্ত কেউ রাখতে পারে নি, ঠিক যেন সেরা কুমোরের হাতে গড়া প্রিতিমেটি: যেমন চোখ, তেমনি নাক, তেমনি কপাল, তেমনি মুখের আদল, আর তেমনি চুলের ঢাল। স্বভাবটিও কি সেই-রকম ?—মুখে একটি উঁচু কথা নেই, আর সেই এতটুকু থেকে নিয়ে এত বড় পয্যন্ত সব্বার ওপর সমদৃষ্টি; কে বলবে ঐ বাপের ঐ মেয়ে! তার সম্বন্ধ ঠিক হোল এক জরদ্‌গবের সঙ্গে দাদাঠাকুর! যেমন মোটা, তেমনি খাড়াই, তেমনি কুচ্ছিত, তেমনি কালো, বয়েস য্যাথনকার কথা বলচি ত্যাখন তার প্রায় তিরিশ হবে। এক ছেলে, একটি পরিবার হজম করে বেলল্লা হয়ে বেড়াচ্ছে। হেন কুকাজ নেই যা কুসমির কুমার করেনি বা করতে পারে না। বিয়ে করতে চায়না, বলে একেবারে ডানাকাটা পরি না হোলে বিয়ে করব না। এদিকে নিজে তো ময়ূরছাড়া কাত্তিক, কোন মেয়ের বাপই ঘেঁসতে চায় না।

"বলবেন তবে চৌধুরী মশাই ঝপ করে রাজি হোলেন কেন? সেখানেও ঐ সব্বনেশে ভালো হওয়ার নেশা দাদাঠাকুর। ভালো হওয়া মানে দাঁড়িয়ে গেল তো নিজের ভালো না করা, তা য্যাত বেশি মন্দ হয় নিজের ত্যাতই ওদিকে ভালোর পাল্লা ঝুঁকবে না?—ত্যাতই বেশি

পাপ ক্ষ্যায় হবে না? যাদের সঙ্গে সাতপুরুষের আড়াআড়ি তাদের পায়ে যদি মাথা পেতে দিতে না পারলুম, একেবারে একটা ডাহা অখাণ্ডের হাতে যদি সোনার কমল না ভাসিয়ে দিতে পারলুম তো আর ভালো হলাম কৈ?···কথাটা এইদিক থেকে দেখতে হবে দাদাঠাকুর, তবে এর মর্ম্মগেরণ হবে।

"দেউড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেল। নিজে হার মেনে রাণীমা আত্মীয়-স্বজন যে যেখানে ছেল চুপি চুপি চিঠি নিকিয়ে সবাইকে ডাকিয়ে আনালে—দুই ননদ, এক খুড়-শাশুড়ি, দুই পিসশাশুড়ি—সবাই এসে যথাসাণ্ডি বোঝালে, কান্নাকাটি করলে, অন্নজল বন্ধ করলে; উঁহু, সেই যে কোট ধরে বসে রইলেন, নড়ায় কার সাণ্ডি।"

বলিলাম—"কিন্তু এই বলছ, এত ভালমানুষ হয়ে গেছেন, এত দয়া সবার ওপর, অত লোকের অত কান্নাকাটিতেও মন টলল না? তা ভিন্ন গুরুজনরাও এসে ধরে পড়লেন বলছ···"

স্বরূপ হাত থামাইয়া আমার পানে চাহিল, একটু হাসিয়া বলিল,—"এ সামাণ্ডি কথাটা আর বুঝলেন না দাদাঠাকুর? দয়া, য্যাতক্ষণ পরের ওপর, নিজের পরিবার, ছেলেমেয়ে—তাদের ওপর দয়া তো আর দয়া হোলনা তেমনি, ভক্তি,—য্যাতক্ষণ সে পরের ওপর, নিজের বাপ্ মা, খুড়ি, পিসি,—এদের ওপর ভক্তি, এদের বাধ্য হওয়া সে তো ঘরোয়া ব্যাপার, তার মধ্যে আর মযোদাই বা কোথায় পুণ্যিই বা কোথায়? বাহিরে দয়া, ধম্ম, নিচু ভাব—যাই বলুন, তা বলে, মেয়ের মুখ চাইতে হবে, পরিবারের বুক চাপড়ানি গেরাহ্যি করতে হবে খুড়ি-পিসির কথায় কান দিতে হবে—তাহলেই তো ধম্ম করা হয়েছে মান্ষের; কথাটা বুঝলেন না?"

বলিলাম—"তারপর কি হোল বল।"

"বিয়ের জন্য হলুস্থুলু পড়ে গেল। এই শেষ কাজ, এর পরেই

বিন্দাবন যাবেন, আয়োজনের আর কোন হিসাব রইল না। যেখানকার যা নাম করা সেরা জিনিষ—বাইজী থেকে নিয়ে রংতামসা, বাজনা-বাত্তি—সব জোগাড় করবার জন্যে চারিদিকে লোক ছুটল—কোথায় কাশী, কোথায় ঢাকা, কোথায় মুর্শিদাবাদ, কোথায় কলকেতা—ত্যাখন রেল হয়নি, ডাকের ব্যাপার, একটা হৈহৈ পড়ে গেল।

"দিন যতই ঘনিয়ে আসতে লাগল রাণীমা ততই যেন পাগলের মতন হয়ে উঠতে লাগল, পেটে ধরেচে তো ?—তার ওপর ঐ রকম মেয়ে, দেবকন্যে বললেই হয়। শেষে য্যাখন কুল্যে তিনটি দিন বাকি, আর কোন রাস্তা না দেখে আমার বাবাকে ডেকে পাঠালেন। কর্তা নেশা-ভাঙ্ ছেড়ে দেওয়ায় বাবার সন্ধ্যেবেলায় আর এদানি কোন কাজ ছেল না; মনমরা হয়ে বসে থাকত, বেশ মনে পড়ে রাণীমার খাস দাসী সৈরভী এসে বাবাকে চুপি চুপি ডেকে নিয়ে গেল।

"সামনে বেরুত না, দোরের আড়ালে দাঁড়িয়ে মেয়েটিকে সামনে এগিয়ে দিয়ে রাণীমা চোখের জল মুছতে মুছতে অনেক কথা বললে বাবাকে—'শিবদাস—বাবার নাম ছেলে শিবদাস—বললে, 'শিবদাস আপ্তহত্যে মহাপাপ, নৈলে মেয়েটাকে বুকে করে কুয়োর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তুম। আর তো কোন উপায় নেই, তুমি পুরণ চাকর—শুধু পুরণই নয়, বংশগত চাকর—কত পুরুষ ধরে তোমাদের বংশে এ বাড়ির অন্নজল খেয়েছে—আর কোন উপায় না দেখে মেয়েটাকে তোমার হাতে সঁপে দিলুম। তুমি মসনের চৌধুরী বংশের নাম ডুবতে দিও না। কিছু একটা উপায় করো, না পারো বিয়ের দিন সন্দের সময় আমার কাছে এসে বলো—পারলুম না রাণীমা—আমি মেয়েটাকে তোমার হাতে তুলে দেব, নিয়ে গিয়ে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিও। আমি কোথায় রাজাপুরের মুকুজ্জেদের ছেলেটিকে মনে মনে এঁচে রেখেছিলুম—যেমন নিকষ

কুলিনের বংশ, তেমনি কাছে পিঠেও হোত।...তা ভাসিয়ে দিয়ে এসো পোড়াকপালীকে।'

"কম কথা নয় তো দাদাঠাকুর, কিই বা খ্যামতা বাবার? অথচ স্বয়ং রাণীমা নিজে ডেকে বললেন অমন কাতরে কাতরে। পরের দিন আর বাবাকে কেউ দাঁতে কুটোটি কাটাতে পারলে না, যখনই দেখ নিঝুম হয়ে বসে ভাবচেই—ভাবচেই—ভাবচেই। সন্দের সময় গিয়ে হঠাৎ ঝেড়ে ঝুড়ে উঠল, মাকে বললে—'রূপোর মা'—বাবা আমায় রূপো বলে ডাকতো—বলল, 'রূপোর মা, বেশ একটু তোয়াজ করে রান্নাটা কর্ দিকিন, জাল ফেলে একটা মাছও তুলে দিচ্ছি।' মা বললে—'সমস্ত দিন উপোসের পর হঠাৎ রান্নার আদর, বলি ব্যাপারখানা কি?' বাবা বললে—'তুই কর্ তো জোগাড়, আজ ফাঁসির খাওয়া খেয়ে নিতে হবে।'...মা সুদোলে—'বলি ব্যাপারখানা কি আগে তাই কও,—এমন অমঙ্গুলে কথা!'...বাবা বললে—'ঐ তো বললুম, আজ ফাঁসির খাওয়া খেয়ে নিতে হবে, কাল এসপার কি ওসপার; তোর সিঁদুরে জোর থাকে ফিরে পাবি, নৈলে থান কাপড় বরাদ্দ।'....এর বেশি আর ভাঙলে না।"

সুতোয় কি রকম একটু জোট পাকাইয়া গেছে; স্বরূপ সেটা ঠিক করিয়া লইয়া আবার আরম্ভ করিল—"মসনের ঠিক বাইরে সরস্বতীর ধারে তাঁবু ফেলে বরযাত্রীরা এসে উঠল। এমন প্রায় পাঁচশ লোক হবে। মসনেতে বিয়ের এমন আয়োজন এর আগে কেউ দেখে নি দাদাঠাকুর, যেমন এদিকে ঘটা তেমনি ওদিকে ঘটা। হাতী, ঘোড়া, পাল্‌কি, তাঞ্জাম, গাড়ি, জুড়ি, বাজনা-বাদ্যি। একটা গুজব উঠল, কুসমির ওনারা নাকি আবার গড়ের-বাদ্যির ব্যবস্থা করেচে, কোলকাতার কেল্লা থেকে নাকি গোরার দল এসে সেই বাজনা বাজাবে। ত্যাখন গড়ের বাদ্যি—এমন হ্যালা-ফ্যালার জিনিষ হয়নি দাদাঠাকুর, গোরাও এরকম বাঁশতলায়,

ডোবার ধারে হ্যাংলার মত ঘুরে বেড়াত না; আমরা সবাই দেখতে ছুটলুম। ভেতরের তাঁবুগুলোর দিকে যাওয়া গেল না, কাজেই চোখে দেখাটা আর হয়ে উঠল না কারুর। নানারকম গুজব উঠল; কেউ বললে বাবুদের তাঁবুর পাশেই তাদের আস্তনা, কেউ বললে এখনও এসে পৌঁচোয়নি, সন্দের সময় ঠিক মোয়াড়ায় এসে হাজির হবে; কেউ বললে গোরা নয়, গোরার সাজপরা মোছলমান বাজনদারের দল। হাজার রকমের গুজব। ব্যবস্থা হল, বরযাত্রীর দল মসনেয় ঢুকে আদ্দেকটা পথ নিজেরা আসবে—রতন দীঘির জোড়া মন্দির পয্যন্ত, সেখান থেকে কন্তেযাত্রীর দল তানাদের অভ্যত্থনা করে নিয়ে আসবে, কত্তা একটু এগিয়ে দেউড়ির সামনেতে গিয়ে অভ্যত্থনা করবেন।....দামোদর চৌধুরীর মেয়ের বিয়ে নিয়ে অনেক গল্প চলিত আচে মসনেয় দাদাঠাকুর, ওরকম আয়োজন আর তার পূর্বে এখানে হয়নি কি না; একটা শুনবেন—বরযাত্রীদের জন্তে রতন দীঘি থেকে সারা পথটা মখমল দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়েছিল। অতটা বিশ্বেস করবেন না, তবে হ্যাঁ, যা হয়েছিল তা এ তল্লাটে কোনখানেই কোনকালে হয়নি—এক রামায়ণ-মহাভারতেই শোনা যায়।

"সন্দের আগে তিনবার ডেকে পাঠালেন রাণীমা প্রথম প্রহরেই লগ্ন, শেষবার ডেকে আর কাকুতি-মিনতি নয়, একেবারে শাপমন্যি—'তোমরা পুরুষানুক্রমে এঁদের নেমক খেয়ে এসেচ, লক্ষ্মীপ্রিতিমে চোখের সামনে ভেসে যেতে দেখেও কিছু করলে না, নিব্বংশ হবে, সমস্ত মসনে শ্মশান হয়ে যাবে, এই আমি পাতব্বাক্যে বলচি'—এই রকম কত কথা, একেবারে পাগলের মতন হয়ে গেছেন কিনা। বাবা মুখটি বুজে শুনে গেল, একটা মতলব ঠাউরেচে, কিন্তু লাগবে কি না লাগবে তার তো ঠিক নেই। শুধু বললে—'মা চেষ্টার কসুর করচি না, তবে সবই তো মা জগদম্বার হাতে।

কাল হয়েচে তিনি অসি ছেড়ে বাঁশি ধরেচে, নৈলে মসনের লক্ষ্মীপ্রিতিমের দিকে কিনা কুসমির কালপেঁচায় নজর দেয়? তবু করচি চেষ্টা, আপনি রাজাপুরের ওনাদের আনিয়ে রেখো চুপি চুপি; না পারি আশীর্বাদ করো তোমার শাপমন্যিগুনো যেন আমার বরে দাঁড়ায়, এ অঘটন চোখে দেখবার আগেই যেন শিবেকে চোখ বুজতে হয়।'

"সেই রকম ব্যবস্থাই করেছেল কিনা বাবা, দাদাঠাকুর। ঐ যে আগের রাত্তিরে মাকে বললে, এসপার কি ওসপার হবে, ফাঁসির খাওয়া খাচ্চি, তার অর্থটা কি? কুমড়ো বলি দিয়ে যখন মার পূজো হচ্চে, চুপি চুপি পুরুতমশাইয়ের হাতে একটি এক নম্বর খাঁটির বোতল তুলে দিয়ে বললে—'পুরুতঠাকুর, কত্তার হুকুমে এসব তো ছেড়ে দিয়েচি, তবে আজ নাকি বড় সুখের দিন; সুদু এক রাত্তিরের জন্য লঙ্ঘন করব কত্তার হুকুম। আপনি বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, আগমে যত মন্ত্র আছে, সব এই বোতলটির মধ্যে ঠেসে খুব কড়া গোছের 'কারণ' করে দিন, যেন এক চুমুকেই জন্ম পালটে যায়।'

"তাই গেলোও দাদাঠাকুর, সেকথা পরে বলচি।

"সন্দের একটু আগে তোড়জোড় করে বরযাত্রী বেরিয়ে পড়ল। মিনিটে মিনিটে কত্তার কাচে লোক পৌছুতে লাগল—কতদুর এগুল, কি কি বিত্তান্ত এই সব খবর নিয়ে। সন্দের একটু পরে গা-ঢাকা হতে বরযাত্রীরা রতন দীঘির জোড়ামন্দিরের সামনে এসে পৌচুল। এখান থেকে এনাদের এলাকা, ঢুদলের বাজনা বাছি, নোক-নস্কর গুছিয়ে একত্তর করে নিয়ে আবার এগুবে। কি ভেবে বাবা আমায় সমস্ত দিন দেউড়িতে নিজের কাচে আটকে রেখেছে। কান পেতে রয়েছি গড়ের-বাছি বাজবে কখন, ও জিনিষ তো শুনিনি আগে কখনও। বাবাকে একবার সুদোলাম, বাবা বললে—'সময় হলেই বাজবে, তুই ঠাণ্ডা হয়ে বোস তো।'

"একটা কথা বলতে ভুলে গেছি দাদাঠাকুর, আসল কথাটাই। দামোদর চৌধুরীর বোনাইয়ের কথা বলেচি না?—সেই যে গোড়াতেই যিনি বোষ্টম বাবাজীকে ডেকে এনে অনিষ্ট ঘটিয়ে বিন্দাবনে চলে গেছল। আজ বিয়ে, আগের দিন বৈকালে তিনি হঠাৎ এসে হাজির। চেহারার সে জলুস নেই, কেমন একটা যেন মনমরা ভাব; কিছু অব্বিশ্যি ভেঙে বললে না নিজের মুখে, তবে আমার মন বললে যেন ওসব বোষ্টম বাবাজীটাবাজী কিছু নয়, কোন এক জোচ্চোরের পাল্লায় পড়েছেল—ফোঁপরা করে ছেড়ে দিয়েচে। যাই হোক, তিনিও হাজির ছেল, ওদিক থেকে বরযাত্রী দেউড়িতে এসে পৌঁচুবে আর শালা-ভগ্নীপতে নেমে গিয়ে অভ্যত্থনা করবে।

"সন্দে উৎরে গিয়ে বেশ গা-ঢাকা গোছের হয়েছে, দলটা এইবার জোড়ামন্দির ছাড়বে, হৈ-চৈ-টা বেড়ে উঠেচে, এমন সময় বাবা যথা-পদ্ধতি গলায় গামছা জড়িয়ে এসে সুদোলে—'হুজুরের সরবৎটা কি এখনই খেয়ে নেবেন আজ? এর পরে আর ফুরসৎ থাকবে না কিনা—তাই জেনে নিচ্চি।'

"আহারের পূর্বে যে সময়টা আগে নেশার ব্যাপার চলত, সে সময় এখন শ্বেতপাথরের জয়পুরী গেলাসে করে এক গেলাস সরবৎ খাওয়ার রেওয়াজ করেছিলেন চৌধুরী মশাই, বাবাই তোয়ের করত, বাবাই এনে দিত। চৌধুরী মশাই বললে—'তা তুই মন্দ বলিস নি, দোরে বরযাত্রী এসে গেল, আর কি ফুরসৎ পাবো?—জোগাড় করগে।'

"এক গেলাসের বেশি খেতেন না, মালটানা মুখে মিছরীর সরবৎ ভালো লাগবে কেন? নেহাৎ মনকে চোখঠারা বৈ তো নয়। বেশি খেতেন না, কিন্তু তোয়াজ ছেল, সেইরকম শ্বেতপাথরের গোলটেবিলের সামনে কৌচে বসে, একটু একটু করে চাখতে চাখতে, গল্প করতে করতে

চলত। বাবা তোয়ের করতে গেল।”....স্বরূপ সতৃষ্ণনয়নে বারদুয়েক কলিকাটার পানে চাহিল হুঁকাটা বাড়াইয়া বলিলাম—“নাও, দুটো টান দিয়ে নাও স্বরূপ।”

একটু দম করিয়া লইয়া কলিকাটি হুঁকার মাথায় বসাইয়া দিয়া স্বরূপ বলিতে লাগিল—“সরবৎ দিয়েই দোরের আড়াল হয়ে বাবা তো কাঁপতে কাঁপতে ইষ্টিমন্ত্র জপ সুরু করে দিলে। সরবতটা কি বুঝচেন তো দাদাঠাকুর? সেই কারণ-করা এক নম্বর বিলিতি মাল, নিজ্জলা খাঁটি একেবারে। তায় ইদিকে দু'মাসের উপোসী, একটা চুমুক দিলেই একেবারে বেহ্মতলে গিয়ে উঠবে।....বাবা তো, বাঁশপাতার মতন কাঁপতে লাগল দাদাঠাকুর। তারপরেই সেই সিঙ্গি ডাক—‘শিবে!’.... বাবা তো দুগ্‌গানাম স্মরণ করে গলায় গামছা দিয়ে সামনে এসে হাজির হোলো। চিন্তামণি ঠাকুর ত্যাখনও চুমুক দিচ্চে, চৌধুরী মশাইয়ের গেলাস খালি। বাবার মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ, চোখ রাঙা হয়ে রয়েচে, গা ঈষৎ দুলচে; জিগ্যেস করলে—‘সরবৎ তুই নিজের হাতে তোয়ের করেচিস?’ বাবা হাতজোড় করে বললে—‘আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর।’....‘খাসা বানিয়েচিস তো; আর আচে?’ বাবা বললে— ‘আজ মেহনৎ পড়বে হুজুরের, তাই একটু বেশি করেই বানিয়েছি।’.... ‘লে আও, রায়মশাই আপনারও চাই তো?’ রায়মশাই বললে—‘তা দিক্, বিন্দাবন ছেড়ে ইস্তক এ রকম সরবৎ কৈ দেখিনি তো!’ তারপরেই স্রেফ ‘লে আও’, ‘আর লে আও’....বাবা সব ব্যবস্থাই করে রেখেছেন, দেখতে দেখতে চারটি বোতল খালি হয়ে গেল। এমন সময় গড়ের বাদ্যি বেজে উঠল, মানে জোড়ামন্দির তলা থেকে বরযাত্রী কনেযাত্রী মিলে আবার এগুতে সুরু করলে আর কি। চৌধুরীমশাই জবার মতন টকটকে চোখ দুটো তুলে সুদোলে—‘বাজনা কিসের?’



বিন্দাবন ছেড়ে ইস্তক এ রকম সরবৎ কৈ দেখিনি তো !

"ওই জন্যেই ব্যবস্থাটা করা কিনা বাবার, মানে পেটে একটু পড়লে চৌধুরী মশাইয়ের আর আগেকার কথা কিছু মনে থাকত না, বাবা

ভাবলে, বিয়ে রদ করতে হলে সেই সাবেকের চৌধুরীমশাইকে ফিরিয়ে আনতে হবে, আর সাবেকের চৌধুরীমশায়কে ফেরাবার ঐ একটি মাত্র মন্তর আচে। বাবার শুধু ভয় ছেল উল্টো না হয়ে যায়, এমন ব্যাপারটা তো হয়নি দু'মাসের মধ্যে।....বললে—'আজ্ঞে, দুগ্‌গা-মাকে বিয়ে করে নিতে এসেচে—কুসুমি থেকে।'........চৌধুরীমশাই টলতে টলতে একেবারে দাঁড়িয়ে উঠল ; এক চুমুকেই জ্ঞান থাকে না—আর এ প্রায় দু'পাঁট সাফ হয়ে গেছে ; রাগটাকে যেন চাপবার চেষ্টা করে সুদোলে—'কার হুকুমে ?........রায়মশাই, আপনি হুকুম দিয়েচেন ?'........রায়মশাই বললে—'আমি ! কুসুমিকে ? তা ভেন্ন এ তো বিয়ের সানাই নয়, গড়ের বাদ্যি, লুটে নিয়ে যাবার ব্যাপার দেখচি যে।'....আর যাবে কোথায় ? দেউড়ি কাঁপিয়ে সেই পুরণ গলা বরযাত্রীর বাজনার ওপর গিয়ে উঠল—'কোই হ্যায় ? কুসমির শালারা এসে আমার ঘর থেকে আমার মেয়ে লুটে নিয়ে যাবে ? গড়ের বাদ্যি বাজিয়ে ? বাগ্‌দিপাড়ার বেটারা নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্চে ? লে আও আমার বন্দুক, একাই লড়েঙ্গা...'

"আর বলতে আচে ? বাবা আন্দাজে আন্দাজে সব ব্যবস্থাই করে রেখেছেল, লুটে বাগ্দির দল রে-রে করে গিয়ে একেবারে বরযাত্রীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপরে সে যুদ্ধ্‌ ! কথাটা বুঝলেন না দাদাঠাকুর ? কুসমির বাবুরাও একটু ধাঁধার মধ্যে পড়ে গিয়ে ভেতরে ভেতরে তোয়ের হয়ে এসেছিল কতকটা—ভাবলে; ভালো রে ভালো, এক কথাতেই মেয়ে দিতে রাজি হয়ে গেল,—মসনের দামোদর চৌধুরী, ব্যাপারখানা কি !...মোছলমানও না, অন্য জাতও নয়, গোরার দলই গড়ের বাদ্যি বাজাচ্ছেল দাদাঠাকুর, কুসমির বাবুদের সরকারে খুব খাতির ছেল্‌ তো ?—বলে-কয়ে কি করে জোগাড় করেছেল। চৌধুরীমশাইয়ের

হুকুমে তাদের ঘেরে-ঘুরে এনে দেউড়ির সামনে দাঁড় করিয়ে দিলে। তারা ভাবলে, এ শ্রাদ্ধের বুঝি এই রীত—তায় মদ গিলে আছে—গলা ফাটিয়ে লড়াইয়ের বাদ্যি শুরু করে দিলে।

"লড়াই আর কি হবে দাদাঠাকুর? একদিকে সমস্ত গ্রাম আর একদিকে গোটাকতক বরযাত্রী—সমস্ত রাত শুধু খোঁজ খোঁজ, মার মার শব্দ, আর তার সঙ্গে গড়ের-বাদ্যি। বরযাত্রীদের কত লোক খানায় পড়ল, কত লোক ডোবায় নেবে হাঁড়ি মাথায় দিয়ে কাটালে, আবার কত লোক সরস্বতী পেরিয়ে পালাতে গিয়ে একেবারে বৈতিরিণীর পারে গিয়ে উঠল। শেষরাত্তির পয্যন্ত শব্দ যদি কমল; বাদ্যি আর থামে না। গোরা, রক্ত গরম হয়ে গেছে কিনা দাদাঠাকুর। বাজিয়ে চলেচে তো বাজিয়েই চলেচে—ঝমোর ঝমোর ঝম্—ঝমোর ঝমোর ঝম্....

"তাই বলছিলুম—গড়ের বাদ্যি শুনেছিলুম সেই একবার। আজকাল তো হুট বলতে গড়ের বাদ্যি, জাতই মেরে দিলে জিনিসটার।"

গুপী নারাণী পাল-বৌ

লড়াইয়ের বাজারে গুপী সামন্ত, যাহাকে বলে, ফাঁপিয়া উঠিয়াছে। উপরো-উপরি কয়টা বছর যেমন ধান হইল, তেমনি পাট, বিক্রয়ও হইল সোনার দরে; চলতি বলিয়া ফাঁপিয়া ওঠা কথাটাই ব্যবহার করিলাম, আসলে গুপী নিরেট হইয়া ফুলিয়া উঠিল।

একটা পুকুর খোঁড়াইল, গ্রামের দুইটা পুকুর ঝালাইয়া দিল, বারোয়ারি তলায় একটা নলকূপ বসাইয়া দিল, আটচালাটার উপরেও টিন বসাইয়া দিল। তাহার পর কাশীনাথের ছোট মেয়ে নারাণীকে বিবাহ করিল।

কাশীনাথের মেয়েগুলি হয় ভালো। গুপীর ইচ্ছা ছিল বড়টিকেই নেয়; সেটি গেলে মেজটির ওপর নজর পড়ে, কিন্তু তখন টানাটানির সময়; কাশীনাথের খাঁই-ও বড্ড বেশি, কথাটা যে তুলিবে, সে হেস্তনেস্ত পর্যন্ত হয় নাই। অনেক দিন থেকে ঐ একটা সাধ, চার শ' টাকা নগদ গুণিয়া দিয়া নারাণীকেই ঘরে আনিল গুপী। ডাগর-ডোগরটি আছে, কাশী বলে বয়স সতের বছর।

গুপীর নিজের বয়স এখন আড়াই-কুড়ি পাঁচ।

এই নারাণী এখন আবদার ধরিয়াছে, তাহাকে কলিকাতা শহর দেখাইতে হইবে।

গুপী বলিয়াছে—"তা দেখবি, এ আর বড় কথা কি?"

কলিকাতার ফ্যাসাদটা আসলে ভুল করিয়া গুপীই তুলিয়াছে। ভুল করিয়াও বলা চলে, আবার শখ করিয়াও বলা চলে। কলিকাতা শহর

যে কি বস্তু, গুপী এই সেদিন পর্যন্ত নিজেও জানিত না। তাহার পর দাঁয়েদের কাছ থেকে পনের বিঘের বন্ধকি চাকলাটা উদ্ধার করিতে যে হাইকোর্ট পর্যন্ত দৌড়াইতে হইল, তাহাতেই কলিকাতার অভিজ্ঞতা গুপীর। এ মামলাটা জেতার পরই নারাণীকে লইয়া আসিল। বয়সকালে সাবেক বৌ রতনের মায়ের সঙ্গে যেসব আলাপ হইত, এ বয়সে তো সেসব ঠিক জোগায় না মুখে, মানায়ও না, গুপী কলিকাতার গল্প দিয়াই নতুন বৌয়ের মন আকর্ষণ করিতে লাগিল—

"দাঁয়েদের বালাখানা দেখেছিস?—একা হাইকোর্টের মধ্যেই তার লাকোখানা এঁটে গিয়ে একটা গোটা ধান-মাড়াইয়ের উঠোন পড়ে থাকবে। এই রকম এই রকম কোটা অলিতে-গলিতে। রাস্তা দেখলে তোর মনে হবে বিছানা ছেড়ে আঁচল বিচিয়ে রাস্তাতেই পড়ে থাকি—যেমন কালো পাথরের মতন রং, তেমনি পালিশ। দেখলে যা মনে হবে তাই বললুম, এদিকে আবার একটু পা দেবে লোকে তার জো নেই,—যেমন মটোর, তেমনি বাস, তেমনি টেরাম। টেরাম বুঝলি?"

নারাণী বলিল—"না তো।"

"ইঞ্জিন নেই, দুখানা রেলগাড়ি, রাস্তার মধ্যি দিয়ে বন্ বন্ করে ছুটেচে—সরো, চাই কাটা পড়ো…"

বধূর বিস্ময়বিমূঢ় মুখের পানে চাহিয়া অল্প হাসির সহিত মাথা দোলাইতে লাগিল। নারাণী প্রশ্ন করিল—"তবে চলে কি করে—হ্যাগা!"

গুপীর হাসি একটু স্তিমিত হইয়া গেল, কেননা চলার রহস্যটা তাহারও আয়ত্ত নাই, বলিল—"চলে…এত বড় রাজত্বটা চলচে কি করে সরকার বাহাদুরের?…তারপর গঙ্গার পুল দেখ্, চিড়িয়াখানা দেখ্,

মরা সোসাইটি দেখ্—দেখে কি মানুষে কুলোতে পারে? আজব শহর কোলকাতা—কথাটা যে চলে আসচে, তা কি মিথ্যে?…একবার নয়, ক'বার দেখলুম, লোকে একবার দেখেই বলে জীবন সাথক হোল—তা একবার নয়, ক'বার দেখলুম।"

ছেলেমানুষ, গল্প শুনিয়া শুনিয়া ঔৎসুক্য বাড়িয়াই চলিয়াছে; এদিকে আবার আদর পাইয়া পাইয়া আবদারেরও অন্ত নাই, একদিন ধরিয়া বসিল তাহাকেও দেখাইতে হইবে কলিকাতা। গল্প করিয়া নিজের গুরুত্ব বাড়ানোই গুপীর উদ্দেশ্য ছিল, মেয়েছেলে হইয়া এমন একটা অসম্ভব আবদার যে করিয়া বসিবে নারাণী, বিশেষ করিয়া কনে-বৌ হইয়া—এটা ভাবিতে পারে নাই। উল্টা গাহিতে আরম্ভ করিয়া দিল দুদিন—জায়গা অবশ্য বড়ই কলিকাতা, তবে সেখানে কি ভদ্রলোকের মেয়েরা থাকে? যাহারা আছে, কোন রকমে নাক-কান বুজিয়া আছে। বাড়ি হইতে এক-পা বাহির হইবার জো নাই, হইলেই হয় ট্রামে চাপা পড়া, না হয় বাসে, না হয় গুণ্ডার হাতে, না হয় মিলিটরি। মেয়েদের মধ্যে খালি মেমসায়েব, না ঘোমটার বালাই, না কাপড়ের বালাই, ঠ্যাং-ঠ্যাঙে ঘাঘরা পড়িয়া ধিঙ্গি হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

'ধিঙ্গি' কথাটার উপর একটু জোর দিয়াই বলিল গুপী, ঘুরিয়া ফিরিয়া কয়েকবারই ঐ কথাটার উপর আসিয়াও পড়িল, যদি একটু সাড় হয় নারাণীর। কি হইল ঠিক বোঝা গেল না, তবে নারাণীর কথা অল্প হইয়া গেল, পরদিন আরও অল্প, তাহার পরদিন আরও।.

গুপী মুশকিলে পড়িল, একা নারাণী নয়তো, তাহার জ্বলজ্বলে সংসার;

সাবেক বৌ রতনের-মা, চার ছেলে, তিন পুত্রবধূ, তিনটি নাতি, চারটি নাতনি। বড় মেয়েটিও শ্বশুরবাড়ি থেকে আসিয়াছে, সঙ্গে দুটি ছেলে। এদের মধ্যে হইতে একাকী নারাণীকে লইয়া যাইলে তো চলিবে না। রতনের মা উপরে উপরে কিছু বলে না, নূতন বৌয়ের আদর-যত্নেরও কোন ঘাটতি নাই, তবু মেয়েছেলেরই মন তো, বরং ওপরে ওপরে নারাণীর চেয়ে তাহাকেই খাতির দেখাইতে হয় বেশি আজকাল গুপীকে। ছেলে, পুত্রবধূ, মেয়ে—এদের মুখটাও একটু ভার ভারই থাকে; চলে এ অবস্থায় শুধু নূতন বৌটিকে লইয়া কলিকাতা দেখিতে যাওয়া?

চলে না তো; কিন্তু তাহার চেয়েও অচল অবস্থা যে এদিকে। অবশ্য কলিকাতা যাওয়ার কথা হইতেই যে এই ভাব, নারাণী তা বলে না, কাজের অছিলায় গা ঝাড়া দেয়, ঘুমের অছিলায় মুখ ফিরাইয়া লয়। কিছু না বলিয়াও মনের কথাটা বেশ স্পষ্ট করিয়া দেয়।

তৃতীয় দিন গুপী বলিল—"কৈ, তুই কলকাতা যাবি বলেছিলি, আর শুনি না যে সেকথা?"

"আমি তো মেমসাহেব লয়।"

"লেও ঠেলা! মেমসায়েব ভেন্ন কেউ আর কোলকাতায় যাবে না?"

"গেরস্তর বৌয়েরা তো সবাই মটোর টেরাম চাপা যাচ্ছে, গুণ্ডার হাতে পড়চে।"

"না পড়চে যে এমন লয়, তা তুই থাকবি আমার সাথে। গুপী সামন্ত পাশে, আর গুণ্ডা এসে গুণ্ডোমি করবে, এমন গুণ্ডোকে একবার দেখতে পেলে হোত যে!...."

"একলা তো যাওয়া যায় না গো, আক্কেল আছে তো মানুষের? দিদি আছে, ছেলে আছে, বোয়েরা আছে, মেয়ে এলো শ্বশুরবাড়ি থেকে, এক কাঁড়ি ট্যাকা...."



"আমি তো মেমসাহেব লয়।"

"তুই আমায় ট্যাকার খোঁটা দিসনে নারাণী করকরে চারটি শো গুণে দিয়ে তোকে ঘরে আনলুম। তুই যখন বের করেছিস মুখ দিয়ে—যাবে সবাই। তার খরচের ভয়টা কি দেখাস গুপী সামন্তকে?"

পরদিন সাবেক-বৌ রতনের মাকে বলিল—"কালীঘাট—কালীঘাট করিস, একবার না হয় চল্ সবাই, এখন একটু ফুরসৎ রয়েচে...."

ঘাঘি মেয়েছেলে, সবই খোঁজ রাখে, সবই বোঝে; ঠোঁটের কোণে হাসি চাপিয়া মুখটা ঘুরাইয়া লইয়া রতনের মা বলিল—"তা চল না নিয়ে, আর তো বুড়োও হয়ে এনু, একটা সাধও না হয় মিটুক জীবনে।"

ঠিক হইল পাল-বৌকেও যাইতে অনুরোধ করা হইবে। পাল-বৌ বিধবা, নেড়া, বয়স প্রায় সামন্তেরই মতো। এদিকে খুব ডাঁটো, অনেক দেখিয়াছে, অনেক ঘুরিয়াছে, মেয়েদের অথরিটি পুরুষদের তোয়াক্কা রাখে না।

(২)

রাত তিনটার সময় গোরুর গাড়িতে চাপিয়া বেলা দশটার সময় সকলে ফলতা-কালীঘাট রেলের পৈলান স্টেশনে পৌছিল। প্রায় সকলেই আসিয়াছে; বাড়িতে আছে বড়ছেলে, মেজছেলে, বড়বৌ, আর নিতান্ত যে কয়টি কুঁচোকাঁচা ছেলেমেয়ে। ওরা তিনজন এর পরে একবার আসিবে। ছেলে দুইটির কলিকাতা দেখা আছে। বড়বৌয়ের বাড়ি ডায়মণ্ডহারবারের কাছে, কলিকাতা না দেখুক, শহর কাহাকে বলে জানে বলিয়া একটু দেমাক আছে; এবারে বাড়ি আগলাইবার জন্য রহিল।

গুপী ও পাল-বৌয়ের কথা বাদ দিলে, এক শুধু রতনের মা রেলগাড়ি কি জানে, একবার এমনি দেখিয়াছে, দুইবার চাপিয়াছে; বাকি সবাই একেবারে থাজা; কৌতূহলে, মন্তব্যে, উল্লাসে, আবার কতকটা ভয়েও নিজেদের কামরাটা সরগরম করিয়া তুলিল।

চাষা-ভূষা মানুষ, চাপা গলায় কথা কহিবার শিক্ষা ছেলে-বুড়া কাহারও নাই, অল্প সময়ের মধ্যেই একটা দর্শনীয় ব্যাপার হইয়া উঠিল। তুলিবার গোলমালের মধ্যে গাড়ি ছাড়িয়া দেওয়ায় গুপীকে কামরাটার শেষ দিকে উঠিতে হইল। সেখান থেকেই প্রশ্ন-মন্তব্য চলিতে লাগিল—“সবাই উঠালো, গুণে মিলিয়ে নিলি—বলি, ও রতনের মা?”

ছোট ছেলে জবাব দিল—“উঠেলো সব। ছোট-মা জিগোচ্চে তানার পুঁটলিটা হাতে ঠিক আচে তো তোমার?....মা জিগোচ্চে নাগলো নাকি তোমার উঠতে গিয়ে?”

পাল-বৌ বাহিরের দিকে মুখ করিয়া বসিয়াছিল, কি ভাবিয়া একটু মুচকিয়া হাসিল।

গোঁটা দুই স্টেশন গিয়া গাড়ি প্রায় খালি হইয়া আসিল। কি ভাবিয়া ছেলেগুলা সব উঠিয়া গুপীর কাছে চলিয়া গেল। খানিকক্ষণ উত্তর-প্রত্যুত্তর নাতনিদের মধ্যস্থতায় চলিল, তাহার পর রতনের মায়ের গলা একটু একটু করিয়া খুলিল, আর মধ্যস্থতার বড় একটা দরকার হইল না। সকলে যখন শাড়ি আর কাপড়ের খুঁট ধরাধরি করিয়া মাঝেরহাট স্টেশনে গাড়ি থেকে নামিল, তখন নারাণীর গলাও স্পষ্ট শোনা যাইতেছে। গ্রামেরই মেয়ে, লজ্জার ভাগটা কখনই বেশি ছিল না, যেটুকু বা ছিল, আহ্লাদের চোটে চারিদিকের বাক্যস্রোতের তোড়ে সেটুকুও ভাসিয়া গেল। দলের একটা হুল্লোড় আছে তো?

তা ভিন্ন সে না বাড়ির গিন্নি—রতনের মায়ের পরেই? তাহার না রতনের মত সমর্থ ছেলে, অনঙ্গের মত মেয়ে, তিলির মত সমর্থ নাতনি?

শিকলের মত হইয়াই সকলে ট্রামে উঠিল; খানিকটা ভ্যাবাচাকা খাইয়া যায়, তাহার পরেই মুখর হইয়া ওঠে, কর্তা হিসাবে গুপী ধমকায়.

দেখায়, বোঝায়। কথা কহে না শুধু পাল-বৌ, সে যেন শক্তি সঞ্চয় করিতেছে—একেবারে চরম প্রয়োজন না হইলে মুখ খুলিবে না। ঐ ভাবেই কালীঘাটের ট্রামে বদলি হইয়া সবাই শেষে ট্রামডিপোয় আসিয়া নামিল।

সঙ্গে সঙ্গেই পাণ্ডার হাতে পড়িল, আদিগঙ্গায় স্নান হইল, কালীদর্শন হইল, আহার হইল। তাহার পর গুপীকে একটু আড়ালে পাইয়া নারাণী বলিল,—"এইবার আসল যার জন্য আসা তার ব্যবস্থা করো।"

গুপী ভিড় কাটিয়া, যাহাতে কথাটা মন্দির পর্যন্ত না পৌঁছায় এইভাবে বলিল,—"ও-কথাটা আর এখানে দাঁড়িয়ে বলিস নে। আসলে তো এই তিথি করতেই আসা, তিথির চেয়ে আর বড় কি আছে এ ছাই সংসারে?"

মা কালীর এলাকার মধ্যে নারাণী আর প্রতিবাদ করিল না বটে, কিন্তু আসল কথা তা নয়, এমন কি শুধু কলিকাতা দেখাও নয়—কলিকাতার মধ্যে যেটুকু 'আসল কথা'র অংশ ছিল, সেটুকু উঠিয়াও আসিয়াছে এরই মধ্যে—ভিড়ে, চেঁচামেচিতে, নানারকম গাড়ির হিড়িকে প্রতিপদেই মোড় ফিরিতে ফিরিতে।....একেবারে আসল কথা বায়স্কোপ। সে নাকি এক আজব জিনিস, কোলকাতা শহরের চেয়েও আরও আজব,—ছবির লোকেরা হাসে, কাঁদে, নাচে, গান গায়, গাড়ি হাঁকায়, দাড়ি কামায়—হেন জিনিস নেই যা করে না। বাড়ির মধ্যে দেখিয়াছে এক গুপী, বড়ছেলে আর মেজছেলে। বড়বৌও বলে দেখিয়াছে, শহরের কাছের মেয়ে কিনা, কিন্তু ওর দেমাকের জন্য ওর কথা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে না।

জিনিসটা সেদিন আসিয়াছিল ওদের মীরগঞ্জে—দাঁয়েদের বড়কর্তার মেয়ের বিয়েতে, তা সামন্তদের সঙ্গে তো ওদের জমি লইয়া ঝগড়া তখন?—কাহারও দেখা হয় নাই।

কলিকাতা দেখার কথাটা পাকা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নারাণী বায়স্কোপের কথাটাও পাকা করিয়া লইয়াছিল। শেষে আলোচনায়-আলোচনায় ঐটেই আসল উদ্দেশ্যে দাঁড়াইয়াছে। নারাণী বলে,—"শুনতেই সামন্তের পরিবার—অনেকের আবার চোখ টাটায়, বলে আহুরি,—আদর তো কত!—সামান্য একটা বায়স্কোপ নিয়ে মীরগঞ্জের এতটুকু মেয়েটি পয্যন্ত যখন বড়াই করে নজ্জায় মাথা তুলতে পারি না, বড়বৌমার দেমাকের কথা বাদই দিনু...."

গুপী ভাবে, না হয় আর একটা আবদার, বায়স্কোপের ওপর তো আর উঠিবে না, এই তো শেষ, বলে,—"তা এবার তুইও বলবি—একেবারে কোলকাতার বাইস্কোপের কথা! মীরগঞ্জের কে তোর সামনে দাঁড়ায় দেখিস না।"

(৩)

কিছু কেনাকাটা করিয়া, চিড়িয়াখানাটা সারিয়া সন্ধ্যার একটু পরে সামন্ত-পরিবার ভবানীপুরের একটি সিনেমার সামনে ট্রাম হইতে নামিল। গুপী থেকে আরম্ভ করিয়া ছোট নাতিটি পর্যন্ত তেরজন, বেটাছেলেদের গায়ে একটা করিয়া পিরান, কাপড়-জামায় খুব বেশি মিল নাই, হাতে এক জোড়া করিয়া নূতন জুতা, সেজ ছেলেটি পায়ে দিয়া মুখ কুঁচকাইয়া খোঁড়াইতেছে। গুপীর গায়ে একটা নূতন ফতুয়া, এখানেই রাস্তার ধারে কিনিল। পরনে ক্ষার দিয়া কাচা কাপড়। বাড়ি হইতে পুরান জুতাজোড়াটাই পরিয়া আসিয়াছিল, অনেক জায়গায় তালি পড়িয়াছে বলিয়া কালীঘাটের বাসাতেই চাবি বন্ধ করিয়া আসিয়াছে; ঠিক করিয়াছিল নূতন একজোড়া কিনিবে, তা

পায়ের মাপে পাওয়াই গেল না ক'টা দোকান ঘুরিয়া। খালি পায়ে আছে।

বৌ আর মেয়েদের পরনে নীল, সবুজ বা ময়ূরকণ্ঠি শাড়ি, বোধ হয় বেশি তোলা থাকার জন্য একটু করিয়া রং-চটা, গায়ে মোটা মোটা রূপার গহনা, কচিৎ ছোটখাট এক-আধটা সোনার। ভ্রূর মাঝখান থেকে মাথার ব্রহ্মতল পর্যন্ত টানা তেলে-গোলা সিঁদুর। নারাণীর চাকচিক্যটা উহারই মধ্যে একটু বেশি।

সিনেমা আরম্ভ হইয়া গেছে, টিকিট ঘরে ভিড় না থাকিলেও কিছু লোক আছে, কয়েকজন পরের শো'র টিকিট কিনিতেছে, কয়েকজন এমনই ঘোরাফেরা করিতেছে।

সেই রকম শাড়ি-ধূতির খুঁট ধরাধরি করিয়া সকলে টিকিটঘরের একপাশে গিয়া দাঁড়াইল। যাহা দেখে তাহাই নতুন, উৎসুক প্রশ্ন-মন্তব্যে ছোটদের মধ্যে একটু সোরগোল পড়িয়া গেল। রতনের মা প্রভৃতি একটু সংকুচিত রহিল, তবে পাল-বৌ সবাইকে ধমকাইয়া, শহর জায়গায় কি করিয়া চলিতে হয় উপদেশ দিয়া গোলমালটা আরও বাড়াইয়া তুলিল। কলিকাতায় পা দেওয়ার পর হইতে তাহার মুখ খুলিয়াছে।

গুপী কাউণ্টারে গিয়া বলিল,—"টিকিস্ দেন বাবু তেরজনের।" ঘুরিয়া মেঠো গলায় প্রশ্ন করিল—"তেরজনেরই তো বটে গো? আর একবার গুণে দেখবেনি, বলি ও পাল-বৌ?"

পাল-বৌ ঘরের ও-প্রান্ত থেকে সেইরূপ গলায়ই উত্তর দিল—"বালাই, ষাট, থেকে থেকে মানুষ গোণে কখনও? যত অলুক্ষুণে কাণ্ড তোমাদের বাপু! বলি গাড়িতে ক'খানা টিকিট নেছলে?"

সবাই অবাক হইয়া গিয়াছিল, পাশের ভদ্রলোকটি গুপীকে বলিল —"একটু সরে দাঁড়াও, একি এ ?"

কারুর কাছে নিচু হওয়া গুপীর ধাতে লেখা নাই, তাহার উপর আবার নারাণী রহিয়াছে, সমস্তায় ফেলিয়া পাল-বৌও মনটা একটু খিঁচড়াইয়া দিয়াছে। ঘুরিয়া বলিল,—"সরে দাঁড়াবটা কেন মশাই ? আপনিও পয়সা দে টিকিস্ কিনচ, আমিও পয়সা দে...."

বুকিং ক্লার্কেরও এতক্ষণে বাক্‌স্ফূর্তি হইল, বলিল—"কিন্তু টিকিট যে নেই আর হে কর্তা।"

গুপী ঘুরিয়া হাঁকিল—"বলি ও পাল-বৌ, টিকিসবাবু যে কয় আর টিকিস্ নেই, সব ফুইরে গেল, তার কি করচ ?"

বুকিং ক্লার্ক একটু তামাসা দেখিবার জন্তই বলিল,—"পাল-বৌকে বলো নিচু ক্লাশের টিকিস ফুরিয়ে গেচে, উঁচু ক্লাশের আছে—একেবারে উঁচু ক্লাশের।"

গুপী ঘুরিয়া শুনিয়া লইয়া হাঁকিল,—"বলি শুনলে কি কয় টিকিস্ বাবু ? কয়—'নিচু কেলাশের টিকিস ফুইরে গেচে, একেবারে উঁচু কেলাশের আছে।' রতনের মা কি কয় ?—একবার লোতুন বৌকেও সুদোবেনি ?"

কাহাকেও সুদানো পাল-বৌএর আসে না, সঙ্গে সঙ্গে সেইরূপ গলায় ঘরের অন্য প্রান্ত হইতে উত্তর দিল—"বলি, নিচের ডালে ফল না পেলে মগডালের ফলটা তুলে নেবেনি ?"

গুপী একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল,—"তা নোব নি ? এ কেমন ধারা কথা বলতেচ ? নিচের ডালে না পেলে মগডালের ফলটা নিতে হবে বৈকি।"

ঘুরিয়া বলিল—"তবে দেন বাবু, উঁচু কেলাশেরই টিকিস দেন।"

কৌতুকের সঙ্গে অবাক হওয়ার ভাবটা চারিদিকেই বাড়িয়া গেল। বুকিং ক্লার্ক একটু হাসিয়া বলিল—"কিন্তু এদিকে সিনেমা আরম্ভ হয়ে গেছে বাবু, পাল-বৌ, নতুন-বৌ সবাইকে জিগ্যেস করে দেখ একবার বরং।"

গুপী আবার ঘুরিল। "বলি, অ পাল-বৌ, বাবু যে কয়—উদিকে শুরু হয়ে গেচে, তার কি করচ?"

পাল-বৌ এবার একটু রাগিয়াই বলিল—"তোমরা শহর জায়গায় এসব ফ্যাসাদ ঘাড়ে করে এসে আর নোক হাসিও নি বাপু। বলি, নেমন্তন্নটা শুরু হয়ে গেলে ফিরো এসো, না...."

"তা কি ফিরে এসি? বলি, তা কি ফিরে এসি?"—বলিয়া অপ্রতিভভাবে ঘুরিয়া গুপী বলিল—"তাহ'লে দেন, ঐ শুনলেন তো?"

জটলা বেশ জমিয়াছে! মন্তব্যও শুরু হইয়া গেছে নানারকম—"পাটের টাকা মশাই! দিন, কত উঁচু ক্লাশের আছে আপনার, কত্তাকে মটকায় বসিয়ে দিন একেবারে।....বাড়িটাই কিনে নাওনা হে কর্তা, টিকিট করবার ল্যাটাই চুকে যাক।....গোটাকতক বক্স্ গছিয়ে দিন না, আছে খালি?....পাল-বৌয়ের সিমিলি-মেটাফোরগুনো জোরালো দেখেছ! আর হাঁ করতে দিলে না কর্তাকে!"

সামন্তের ভ্রূক্ষেপ নাই।

বুকিং ক্লার্ক সেইরূপ অল্প হাসিতে হাসিতেই বলিল—"তাহলে ঠিক করে গুণে বলো কতগুনো দিতে হবে—আন্দাজে তো দেওয়া যায় না?"

গুপীর বোধ হয় সাহস কমিয়া আসিতেছিল, তবু নিরুপায়ভাবে বলিল—"ঐ শুনলে টিকিসবাবু কি বলছেন তোমায়, বলি অ পাল-বৌ? একবার না গুনলে চলচে না যে, তার কি করচ?"

গুপীর সেজছেলে ভগীরথ খুব উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছিল, বলিল—"আমি গুণে দেব বাবা?"

"তোদের ঠানদি'কে সুদ্দো।"

পাল-বৌ বলিল—"তবে এক গরু, দু' গরু করে গোণ্; খবরদার 'জন' বলবি নি। জানি না বাপু, যেমন বড়মুখ করে নিয়ে এনু, তেমনি ভালয় ভালয় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি সবগুনোকে তবেই…"

(৪)

প্রবেশপর্ব আরম্ভ হইল। প্রথমে সবার হাতে হাতে টিকিট থাকিবে কি সামন্তর হাতেই থাকিবে, সেই লইয়া একটা সমস্যা উঠিল। সেটা পাল-বৌয়ের একটা উপমায় সমাহিত হইলে সকলে দরজার গোড়ায় গিয়া জমা হইল। গুপী টিকিটগুলা দিয়া এক-পা ভিতরে দিয়াই সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া আসিল। পূর্বে যে দুইবার গেছে আলোয়-আলোয় গেছে, মুখটা অন্ধকার করিয়া বলিল—"ভেতরে যে অমাবস্তের আঁধার, তার কি করচ, বলি হ্যাঁ পাল-বৌ?"

টিকিট চেকার বুকিং ক্লার্কের পানে চাহিয়া একটু ঘাড় নাড়িল—অর্থাৎ, বাধাইয়াছেন একটা ফ্যাসাদ। গুপীকে বলিল—"কিছু ভাবনা নেই গো কর্তা, ভেতরে আলো দেখিয়ে নিয়ে যাবে, চেঁচামেচি করো না কিন্তু। এসো, এক-একজন করে ঢোকো।"

ভেতরের গাইড্‌কে বলিয়া দিল—"একটু কেয়ারফুলি নিয়ে যান।"

পাল-বৌ লাইনটা ঠিক করিয়া দিল: প্রথমে থাকিবে সামন্ত, তাহার পর নিচের দিক থেকে বয়স অনুসারে ছেলেরা, তাহার পর বয়স

অনুসারে ছোট মেয়েরা, তাহার পর রতনের মা, অনঙ্গ, নারাণী, সব শেষে পাল-বৌ, পাকা রক্ষী হিসাবে। খুব সাবধান করিয়া দিল—"কেউ কাউকে ছাড়বি নি, খবরদার!....এ মীরগঞ্জের কাত্তিক পুজোর মেলা নয়।"

টর্চ জ্বালিয়া গাইড্ সামনে চলিয়াছে। জন চারেক যখন ভিতরে গিয়াছে গুপী সাড়া পাইবার জন্য হাঁক দিল—"ভগা আচিস? তিলি আচিস? নক্ষী আচিস? ন্যাংটা আচিস?...."

"সাইলেন্স্! সাইলেন্স্! চুপ করুন। চুপ করো।"—করিয়া সমস্ত ঘরের মধ্যে একটা তুমুল কলরব উঠিল। Silence-লেখা লাল হরফগুলা ঘন ঘন জ্বলিতে নিভিতে লাগিল। যাহারা চুপ করিবার আদেশ জারি করিল, তাহাদের চুপ করিবার জন্য আবার অন্য দলের গলা উঠিল। এদিকে ভয়ে কচি ছেলেমেয়েগুনো গলা ছাড়িয়া কান্না জুড়িয়া দিয়াছে; এক মুহূর্তের মধ্যেই অন্ধকার ঘরটা একেবারে উৎকট হইয়া উঠিল। একে অন্ধকার, তায় হঠাৎ এই ব্যাপার, সামন্ত ঘাবড়াইয়া গিয়া আরও গলা তুলিয়া হাঁকিল—"পাল-বৌ আচো? বলি অ পাল-বৌ? লোতুন বৌ আচে? বলি রতনের মা...."

কলরব উঠিল যেন ছাত ভাঙ্গিয়া পড়িবে।—"চুপ করো!....ঘাড় ধরে বের করে দাও!....স্টপ্—স্টপ্!...বন্ধ করে দাও! আলো জ্বালো ....লাইট—লাইট!"

সবার উপরে পাল-বৌয়ের কণ্ঠস্বরের ভগ্নাংশ শোনা গেল—"ঠিক আচি....আমার জন্যে ভেবুনি।...."

এমন সময় আলো জ্বলিয়া উঠিল। ইহারা সকলে ততক্ষণে ভিতরে আসিয়া গেছে এবং খুঁট না ছাড়িয়া গুপীর চারিদিকে মধ্যের রাস্তাটার উপর জটলা করিয়া দাঁড়াইয়াছে। ছেলেমেয়েগুলার কান্না থামিয়া গেছে,

সবাই হাঁ করিয়া মাথা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখিতেছে, মুখে কাহারও প্রশ্ন-মন্তব্য কিছুই নাই, একেবারে হতভম্ব হইয়া গেছে।

এদিকে প্রায় হাজার দুয়েক লোকের প্রত্যেকের দৃষ্টি তাহাদের উপর নিবদ্ধ। নির্বাক, একটা স্থঁচ ফেলিলে তাহার আওয়াজটি শোনা যায়। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড মাত্র, তাহার পরই আবার কলরবটা মাথা চাড়া দিয়া উঠিল, যেন আরও উগ্ররূপে। "বের করে দাও"।....থার্ড ক্লাশের দিকে নিয়ে যাও।....কে ওদের ঢুকতে দিলে?....ম্যানেজার কোথায়? গেট্ আউট্ !!"

প্রায় সব গাইডগুলাই একত্র হইয়া টানাছেঁড়া করিবার উদ্যোগ করিয়াছে—"এদিকে....এদিকে এস.......না, ওদের থার্ড ক্লাশে আসতে দিন........টিকিট আচে তোমাদের?....কি করে ঢুকে পড়ল দলবল সুদ্ধ?....চলো বাইরে...."

চারিদিক থেকে থাবা খাইয়া সামন্ত একেবারে মরিয়া হইয়া উঠিল, দলের সবাইকে ঠেলিয়া সামনে আসিয়া গলাটা একটু বাড়াইয়া মুখ খিঁচাইয়া বলিল—"বাইরে যেতে হবে বটে! গুণে দু'কুড়ি নোট দিয়ে টিকিস্ কিনেচি, তার আধখানা এখনও মুঠোর মধ্যি রইচে!....বলে কি করে ঢুকলে—বাইরে চলো!"

ঘাড় ফিরাইয়া বলিল—"একবার আল্লাদের কথাটা শুনেচ পাল-বৌ? বলে বাইরে যাও!"

পাল-বৌ থতমত খাইয়া গিয়াছিল, কি রাগ জমাইতেছিল, বলা যায় না; সামন্তর কথায় কোমরে দুইটা হাত দিয়া সামন্তর চেয়েও এক-পা অগ্রসর হইয়া একটু ঝুঁকিয়া মাথা দুলাইয়া দুলাইয়া বলিল—"কী আমার সাতপুরুষের কুটুম রে, ওনার কথায় বাইরে যেতে হবে! কলকেতা দেখাতে এয়েচে; আইন নেই? আদালত নেই? হাইকোর্ট নেই?

এই পাল-বৌ এসে সামনে দাঁড়াল, দেখি একবার অবলা মেয়ের গায়ে হাত দিয়ে কে....”

এমন সময় ম্যানেজার আসিয়া উপস্থিত হইল। এতক্ষণ টিকিটঘরে, গেটে, আত্মোপান্ত তথ্য সংগ্রহ করিতেছিল, সম্ভবত এ অবস্থায় জবরদস্তি বাহির করিয়া দেওয়া চলে কিনা, ফোনে সে সন্ধানও লইতেছিল। শান্তকণ্ঠে বলিল—“ওগো বাছা থামো! বের করতে যাবে কেন, তার দরকারই বা কি? চলো দিকিন, তোমাদের জন্যে আলোর ব্যবস্থা করে দিয়েচি, যাও এবার নিজের নিজের জায়গায় গিয়ে বস। তাড়াবার কথা কি আছে?”

একজন গাইডকে বলিল—“যাও, কত্তাকে, পাল-বৌকে আর সবাইকে যত্ন করে নিজের নিজের জায়গা দেখিয়ে দাও।”

এতক্ষণ দর্শকদের সবাই একেবারে নির্বাক ছিল, এরা অগ্রসর হইতেই প্রথম শ্রেণীর যাহারা একেবারে কাছের, তাহাদের মধ্যে অতি-সৌখীন গোছের কয়েকজন প্রবল আপত্তি করিয়া উঠিল—“এখানে নয়! —এদিকে নয়!—নিচের দিকে নিয়ে যাও!....”

কিন্তু পাল-বৌয়ের অবলা-নারীত্ব তখন সম্পূর্ণ জাগিয়া উঠিয়াছে। “মেনিমুখোদের কম্ম নয়, তুমি পেছনে যাও।” বলিয়া সামন্তকে পিছনে ঠেলিয়া তাহার জায়গায় দাঁড়াইয়া আবার অগ্রসর হইতে হইতে ছলিয়া ছলিয়া আরম্ভ করিল—“উঁচুর ট্যাকা গুণে দিয়ে নিচুতে গিয়ে না বসলে সুখ হবে কেমন করে বাবুদের! ইস্ বাবু! নিফাইন ধুতি-চাদর, ফুরফুরে গন্ধ!....এই আমি বসনু, তোরাও সব বোস গ্যাট হয়ে, কোন্ বাবু ওঠায় একবার....”

ম্যানেজার চলিয়া গিয়াছিল, আলো নিভিয়া আবার সিনেমা শুরু হইয়া গেল।

*   *   *   *

বেশ খানিকটা হিড়িক গেল। টাকাও একচোট বাহির হইয়া গেছে জলের মতোই। তা যাক্, সামন্তর বিশেষ খেদ নাই, আবদারের হাত হইতে রক্ষা পাইবে অন্তত। একটু সুখ হইয়াছে, বুড়ো বয়সে শখ করিয়া একটা বিবাহ করিল, তা আবদারে অভিমানে একেবারে যেন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল। আর কি, গাড়ি হইল, টেরাম হইল, বাস হইল, কালীঘাট হইল, সিনেমা হইল—সারা কলিকাতাই হইয়া গেল, বাকিটা কি রহিল ?

প্রথম দেখাতেই আবার সেই মুখভার, কথা বন্ধ। গুপী প্রথমটা তো হাঁ করিয়াই রহিল, কথা বাহির হইবার মতো অবস্থা হইলে বলিল —"ব্যাপার কি রে নারাণী ? সবই তো হোল—ট্যাকাকে তো ট্যাকাই বললুম না।"

"ট্যাকা নিয়েই থাকো।"

"না হয় বলই কথাটা কি ?"

অনেক সাধাসাধির পর নারাণী মুখ খুলিল, "একখানা বনলতা শাড়ী আর একজোড়া বনলতা ঝুমকো...."

"সে কি ? বাপের কালেও তো লাম শুনিনি !"

"ঐ যে মেয়েটা পরেছেল—এইরকম নাক, টানাটানা চোখ....বাজারে ঐ নাম বললেই পাওয়া যায়, অবিশ্যি কোলকাতায়...."

"তুই নাম টের পেলি কার কাছে তাই সুদুই? ঝগড়ায় আর অন্ধকারেই তো কেটে গেল!"

মাসখানেক পরে অনেক চেষ্টায়, প্রচুর ব্যয়ে হইল সংগ্রহ। খুব গোপনে সরবরাহ করিয়া সামন্ত বলিল—"তেমনি কোন কিছু হলে পরবি, লুকিয়ে থো। এবার হোল তো?"

দুইটা দিন কিছু নয়, আবার তৃতীয় দিনে অভিমান, মুখভার, কথা বন্ধ। আবার খানিকটা হাঁ করিয়া থাকিবার পর যখন কথা কহিবার সামর্থ্য হইল, সামন্ত প্রশ্ন করিল—"আবার কি হোল রে নারাণী। সব দিলুম তো এনে। ট্যাকাকে তো খোলামকুচি ক'রে থুলুম।"

"ট্যাকা নিয়েই থাকো তুমি।"

"না হয় শুনিই ভেতরের কথাটা কি?"

"তুমি আর অমন হেঁটু পয্যন্ত কাপড় পরে গায়ে ময়লা গামছা দিয়ে বেইরো নি।"

"তবে?"

"তবে কি?—একটা পিরান তোয়ের করাও। গলার এখানটা বন্ধ, এইরকম বেঁকা পটির ওপর বোতাম, কনুয়ের কাছটা ফোলা, কব্জির ওপর কড়াক্কর করে চাপা, হাঁটু পয্যন্ত ঝুল। সেই যে ফর্শা ছেলেটার গায়ে ছেল, মেয়েটার বরের। পিরু দরজির কম্ম নয়, সেই কোলকাতা থেকেই আনতে হবে। কে জানে, বিরুয়া-পাঞ্জাবী না কি একটা নাম শুনমু যেন...."

এবার যা হাঁ হইল সামন্তের, সহজে আর বন্ধ হইল না।